মধু বসন্ত

ইন্দুভূষণ দাস

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস

৭২, হ্যারিসন রোড :: :: কলিকাতা-৯

প্রকাশক : ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা—৯

আগস্ট, ১৯৫৭

দুই টাকা

মুদ্রাকর : শ্রী কানাইলাল ঘোষ
বিহার-বেঙ্গল প্রেস
৭১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

॥ এক

উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন অমলা দেবী। কত কথাই মনে হচ্ছে তাঁর: কই, এখনো তো ফিরলো না রজত! তবে কি উকিলবাবু পারেননি কিছু করতে! সত্যিই কি কোম্পানির মালিকানা থেকে চিরদিনের জন্য আমরা বঞ্চিত হলাম!

এই সব কথা মনে হতেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অমলাদেবীর বুকের ভিতর থেকে।

মায়ের অবস্থা দেখে উর্মি বলে—তুমি দেখছি ভেবে ভেবেই শেষ পর্যন্ত অসুখে পড়বে, মা। কি হবে অতো ভেবে বলো তো? না হয় দুঃখে কষ্টেই দিন যাবে আমাদের। তাছাড়া কোম্পানি হাতছাড়া হলেও জমিদারি তো রয়েছে। সেটা তো আর হাতছাড়া হবে না।

উর্মির কথা শেষ হবার আগেই রজত এসে দাঁড়ায় অমলাদেবীর সামনে। তারপর কোন ভূমিকা না করেই সে বলে—কোন সুবিধাই হ'ল না, মা। আমি বরং কালই রায়পুর রওনা হই।

—তা ছাড়া আর উপায় কি, বাবা। কিন্তু আমাদের যা ভাগ্য

তাতে হয়তো ওখানে গেলেও দেখবে সবই গোলমাল হয়ে আছে।

—কিন্তু তুমিই না বললে, জমিদারির অর্ধেক মালিক আমরা।

—তা তো বলছিই। কিন্তু মালিক হয়েও যে মালিকানা থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তার প্রমাণ তো খনির ব্যাপারেই দেখতে পেলে। জমিদারির ব্যাপারেও আমি খুব ভরসা পাচ্ছি না। কারণ, তোমার কাকা লোকটি বড় সহজ নন।

—তিনি সহজ না হ'তে পারেন, তবে আমিও মাটির ডেলা নই, মা। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে লড়বার মত কিছু কিছু বিদ্যে এবং সাহস আমার আছে। মাইনের ব্যাপারে অবশ্য কিছু করতে পারিনি, তার কারণ ওখানে আইন আমাদের বিপক্ষে। কিন্তু জমিদারির ব্যাপার সে রকম নয়। ওখানে আইন আমাদের সপক্ষে। আমি কালই রওনা হব স্থির করেছি।

—বেশ, তাহলে সেই মর্মে কাকাকে একখানা তার করে দাও।

—না মা, নিজেদের জমিদারিতে যাব, তার জন্য কারো কাছে তার-টার করা আমার দ্বারা হবে না।

—বেশ, তাহলে তাই কর। তবে একটা বিষয়ে আমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে।

—কি বিষয়ে, মা ?

—নিতান্ত বাধ্য না হলে কাকার সঙ্গে অসদ্ভাব করবে না।

—ও, এই কথা ! বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, কাকা গায়ে পড়ে ঝগড়া না বাধালে আমি কিছু করবো না। কেমন, হলে তো, নিশ্চিন্দি ?

—হ্যাঁ বাবা, আর আমার কোন ভয় নেই।

—ভয় ! তুমি কি কাকাকে ভয় কর নাকি ?

—আগে করতাম না। কিন্তু তোমার বাবা মারা যাবার পর থেকে করছি।

—কেন বলো তো ?

—তোমার কাকা নাকি দরকার হলে নরহত্যা করতেও পিছপা

নন। নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে যে-কোন হীন কাজ তিনি করতে পারেন।

মায়ের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে রজত বলে—বাংলা দশটা এখনও মগের মুলুকে পরিণত হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। ়াড়া কাকাকে যদি 'ফেরোসাস' বলেই ধরে নেওয়া যায়, তবুও মার সঙ্গে শত্রুতা করা খুব সহজ হবে না তাঁর পক্ষে। যাই হোক মি ওসব চিন্তা না করে বিশ্রাম নাও গিয়ে।

—আমার বিশ্রামের জন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তার নিজে একটু বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করো।

—আজকের দিনটি আর আমার ভাগ্যে বিশ্রাম নেই, মা। যাবার গোছগাছ করতেই সময় চলে যাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। আমার সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরেছে, নিয়ে যাব ওকে?

—সে কি! উর্মি গেলে আমি এখানে একা থাকবো কি করে?

রজত লজ্জিত হয় অমলাদেবীর কথা শুনে। বলে—আমি অতটা ভবে বলিনি, মা।

এই বলে উর্মির দিকে তাকিয়ে বলে—তুই মায়ের কাছেই থাক্, র্মি। যেতে হয়, পরের বার যাবি।

উর্মি বলে, 'আচ্ছা"

এর পর দিনই রজত হাজারীবাগ রোড স্টেশনে এসে হাওড়াগামী কখানি এক্সপ্রেস গাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে বসে।

রজতের বাবা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এ পাশ করবার পর পেরেছিলেন, সমাজে মাথা উঁচু করে বাস করতে হলে কার ব্যবসায় করা। ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরাই আধুনিক মাজের মাথা। তিনি তাই তাঁর বাবার কাছে হাজার পঁচিশেক চান ব্যবসায় জন্য। কিন্তু রায়পুরের ডাকসাইটে জমিদার মহেন্দ্র

চৌধুরী ছেলের এই বণিকবৃত্তির প্রতি ঝোঁকটাকে সুনজরে দেখেন না। ছেলের মতিগতি ফেরাবার উদ্দেশে তিনি তখন তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দেন কলকাতার এক নামকরা ধনী পরিবারের মেয়ে অমলার সঙ্গে।

মহেন্দ্র চৌধুরী হয়তো মনে করেছিলেন, বিয়ের পর ছেলে আর ঘরছাড়া হবে না। কিন্তু কার্যকালে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। যে সরষে দিয়ে তিনি ভূত ছাড়াতে চেয়েছিলেন, সেই সরষেই ভূত হয়ে দেখা দেয়। বিয়ের বছরখানেক পরেই দেখা যায় পৈত্রিক সাহায্য না নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছেন।

ব্যবসাজগতে দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশের মূলে ছিলেন তাঁর শ্বশুর হরিশঙ্কর রায়। তিনি ছিলেন এক সুপ্রতিষ্ঠিত আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে সেই সময় এক মার্কিন কোম্পানি ছয় লাখ টাকার অভ্রের চাদর আমদানির জন্য হরিশঙ্কর রায়ের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছিল। চিঠিপত্রের মাধ্যমে দর দাম ইত্যাদি ঠিক হয়ে যখন মাল রপ্তানির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় এক বিপর্যয় ঘটে যায়। উক্ত মার্কিন কোম্পানি হঠাৎ এক চিঠি দিয়ে হরিশঙ্কর রায়কে জানিয়ে দেয় অন্য এক কোম্পানি থেকে কম দর পেয়ে তারা সেই কোম্পানিকেই অর্ডার দিয়েছে।

এই চিঠি পেয়ে হরিশঙ্করবাবু একেবার মাথায় হাত দিয়ে বসেন। তাড়াতাড়ি মাল পাঠাবার উদ্দেশ্যে অর্ডার পাবার আগেই তিনি সমস্ত মাল কিনে ফেলেছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, সময় থাকতে মাল কিনে মজুদ করে না রাখলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাল রপ্তানি করা যাবে না।

হরিশঙ্করবাবু যখন ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির, সেই সময় দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ এসে হাজির হন তাঁর বাড়িতে। শ্বশুরবাড়িতে এসেই তিনি দেখেন ছয় লাখ টাকার অর্ডার বানচাল হওয়ার ধাক্কা হরিশঙ্করবাবুর অন্দরমহলেও এসে লেগেছে।

অমলার কাছে সব কথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ একদিন তাঁর শ্বশুরকে জানান তাঁকে যদি আমেরিকায় পাঠানো হয় তাহলে মালগুলো তিনি অনেক বেশি দরে বিক্রির ব্যবস্থা করে আসতে পারেন।

হরিশঙ্করবাবু প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের কথা হেসেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন বুঝিয়ে দেন আমেরিকায় ভারতীয় অভ্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশি এবং অভ্র বিক্রির লাভের বড় অংশ ওখানকার মুষ্টিমেয় আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানই পকেটস্থ করে, তখন তিনি সে কথার সারবত্তা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অবশ্য সারবত্তা স্বীকার করেই চুপ করে বসে থাকেন না তিনি; দেবেন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠাতেও তিনি রাজী হন।

এর কিছুদিন পরই দেবেন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক যান এবং মাস দুই সেখানে থেকে বেশ চড়া দামে হরিশঙ্কর বাবুর মজুদ মালগুলোর অর্ডার সংগ্রহ ক'রে 'লেটার অব ক্রেডিট' পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ফিরে আসবার আগে আরও কয়েকটা কোম্পানি থেকে প্রায় সতের লাখ টাকার 'মাইকা সিট'এর অর্ডার সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন তিনি।

দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দেখে হরিশঙ্করবাবু এমন খুশি হন যে, তাঁকে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হন না। তিনি চান নিজে আলাদাভাবে ব্যবসায় করতে। নিউইয়র্কে ভারতীয় অভ্রের অসাধারণ চাহিদা দেখে তাঁর ইচ্ছা হয় আমেরিকার সঙ্গে ঐ জিনিসের চালানি কারবার করবার।

জামাতার ইচ্ছার কথা শুনে হরিশঙ্করবাবু খুশিই হন এবং নিজেই খোঁজাখুঁজি করে দেবেন্দ্রনাথের জন্য একখানা ভাল অফিস ঘর ভাড়া করে দেন। অফিস চালাবার প্রাথমিক খরচপত্রের জন্য হাজার দশেক টাকাও তিনি দেন। এ ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট অভ্র-খনির মালিকের সঙ্গেও তিনি দেবেন্দ্রনাথকে পরিচিত করে দেন।

হরিশঙ্করবাবুর কাছ থেকে এইভাবে সাহায্যলাভ করে কয়েকদিনের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন অফিসের গোড়াপত্তন করেন। তোম্পানির নাম দেন—'মাইনিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া।'

বছর দুইয়ের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ে লাভ হতে আরম্ভ হয়। অভ্রের চালানও আরম্ভ হয় বেশ ভালভাবেই। কিন্তু দুই বৎসর অফিস চালিয়েই তিনি বুঝতে পারেন এই ব্যবসায়ের আসল লাভ যাচ্ছে খনি-মালিকদের সিন্দুকে। এরপর এই বিষয়টা নিয়ে যতই তিনি চিন্তা করতে থাকেন, ততই তিনি বুঝতে পারেন ভালভাবে অভ্রের ব্যবসা চালাতে হলে নিজস্ব খনি থাকা বিশেষ দরকার।

দেবেন্দ্রনাথ জানতেন যে, বিহারের কোডারমা অঞ্চলেই অভ্রখনি বেশি। তিনি তখন অফিসের ভার কিছুদিনের জন্য ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে নিজে কোডারমা চলে যান খনি পত্তন করবার উদ্দেশ্যে।

সুযোগও তিনি পেয়ে যান অপ্রত্যাশিতভাবে। ওখানকার এক অভ্রখনির দুই অংশীদারের মধ্যে তখন গভীর মনোমালিন্য চলছিল। তাঁরা দুজনেই খনিটাকে বিক্রি করে দেবার চেষ্টায় ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ এ সুযোগ নষ্ট হতে দেন না। তিনি তখন খনির মালিকদ্বয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং 'ডিপজিট' ইত্যাদি পরীক্ষা করে কয়েকদিনের মধ্যেই খনিটাকে কিনে ফেলেন।

খনি কিনবার পর দেবেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ে আরও বেশি লাভ হতে থাকে। তিনি তখন কলকাতার অফিসটিকে শুধু চালানি অফিসরূপে রেখে নিজে চলে আসেন কোডারমায়।

ক্রমে কলকাতা অফিসে তখন এত বেশি অভ্রের অর্ডার আসতে থাকে যে, একটি মাত্র ছোট খনির উৎপন্ন দ্রব্যে তার এক চতুর্থাংশও সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

দেবেন্দ্রনাথ তখন তাঁর প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করে এক বিস্তীর্ণ খনি অঞ্চল কিনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন।

সুযোগ্য পরিচালনার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভ্রখনিরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

এর কিছুদিন পরেই আমেরিকার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বেধে যায়। কলকাতার বাজারে আরম্ভ হয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। অভ্রের দামও বাড়তে বাড়তে প্রায় আটগুণ হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ তখন কল্পনাতীত লাভ করতে আরম্ভ করেন।

ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তিনি তখন কোম্পানির প্রধান কার্যালয়টিকে হাজারীবাগ শহরে স্থানান্তরিত করেন এবং কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে মাসিক তিন হাজার টাকা বেতন নিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু এত টাকা রোজগার করলেও যুদ্ধের পর তাঁর হাতে নগদ টাকা বিশেষ কিছু থাকে না। না থাকবার কারণ, নিজের রোজগারের টাকায় তিনি হাজারীবাগ শহরে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করেন প্রায় দুই লাখ টাকা ব্যয় করে।

এই টাকা তিনি ইচ্ছা করলেই কোম্পানি থেকে কৌশলে বের করে নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। নিজের প্রাপ্য বেতনের টাকা ছাড়া আর কোন টাকা তিনি কোম্পানি থেকে নিতেন না। হিসাবের কারচুপি করে অংশীদারদের বঞ্চিত করা এবং সরকারকে আয়কর ফাঁকি দেওয়া তিনি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করতেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা ইতিমধ্যে দেহত্যাগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তার ছোট ভাই নরেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশুনা করতে থাকেন।

নরেন্দ্রনাথের ধারণা, তাঁর দাদা আর কোনদিন এসে জমিদারির আয়ে ভাগ বসাবার চেষ্টা করবেন না। বেঁচে থাকতে তিনি তা করেনওনি।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মাইকা খনির মালিকানা যখন পরিচালক পরিষদের হাতে চলে গেল, তখন বাধ্য হয়েই রজতকে আসতে হল রায়পুরে।

জমিদারি থেকে তাদের প্রাপ্য অংশের টাকা এখন তাদের দরকার।

॥ দুই ॥

রায়পুর এসে কয়েকটা দিন শুয়ে বসে এবং ঘোরাঘুরি করে কাটাবার পর একদিন রজত তার কাকা নরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলে —আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, কাকা।

নরেন্দ্রনাথ তখন দুপুরের আহার শেষ করে দোতলার বারান্দায় বসে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে ধূমপান করছিলেন।

রজতের কথা শুনে তিনি গম্ভীর স্বরে বলেন—কি বলতে চাও বলো!

—আমি বলছিলাম, এখন থেকে আমাদের অংশের যে আয় হয় সে আয় যাতে ঠিকমত আমরা পাই তার একটা সু-ব্যবস্থা করা দরকার।

রজতের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে যান। প্রায় মিনিটখানেক ধূমপান করবার পর তিনি বলেন—বেশতো, তোমাদের অংশ তুমি যদি বুঝে নিতে চাও, সে তো সুখের কথা! তবে কথা কি জানো, বাইরে থেকে এই জমিদারির আয় সম্বন্ধে লোকে যা ভাবে, আসলে তা মোটেই নয়। এইতো তুমিই হয়তো মনে করেছো এতদিন তোমাদের অংশের টাকা সবই বুঝি কাকা খেয়েছে। কিন্তু হিসাবপত্র দেখলেই বুঝতে পারবে জমিদারির যা আয়, তা থেকে লাটের খাজনা, মামলা-মোকদ্দমার ব্যয়, আমলা-কর্মচারী পাইক-বরকন্দাজদের

বেতন, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির ব্যয় সংকুলান করবার পর উদ্বৃত্ত এক-রকম কিছুই থাকে না।

এই পর্যন্ত বলেই আবার তিনি ধূমপানে মনোযোগ দেন। বেশ কিছুক্ষণ ধূমপান ক'রে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নলটাকে গড়গড়ার গায়ে জড়িয়ে রেখে দেন। তিনি আবার শুরু করেন—তবে হ্যাঁ, আদায়পত্র যদি ঠিকমত হয় তাহলে আয় যে একেবারে হয় না তা নয়। কিন্তু দিনকাল যা হয়ে উঠেছে তাতে তো মামলা না করলে কোন ব্যাটাই' টাকা দিতে চায় না।

একটু চুপ করে থেকে নরেন্দ্রনাথ আবার বলেন—হ্যাঁ, ভাল কথা, দাদা তো শুনতাম মস্তবড় 'মাইন'-এর মালিক। অনেক টাকা আয় ছিল তাঁর। তাহলে তোমাদের তো টাকার অভাব হবার কথা নয়!

এই বলে একটু হেঁ হঁ করে হাসেন তিনি। ছন্দহীন বেমানান হাসি।

তারপর একটু দম নিয়ে বলেন—ব্যাপার কি জানো, রজত, দাদা যে কারবার আর বাড়ি-ঘর করেছেন, হিন্দু-আইন অনুসারে তার সবই যৌথসম্পত্তি। আইন-মোতাবেক আমারও অংশ আছে তাতে, হেঁ হেঁ হেঁ—।

এই হেঁ হেঁ-র অন্তরালে নরেন্দ্রনাথ কি বলতে চান বুঝতে দেরি হয় না রজতের। সে তাই প্রতিবাদের সুরে বলে—আপনি ভুল করছেন কাকা, বাবার নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই। 'মাইন'টি পাবলিক লিমিটেড্ কোম্পানি। ওর মালিক অংশীদাররা। আমরাও এখন অংশীদার ছাড়া আর কিছু নই। আর বাড়ি! ওটা আমার মার সম্পত্তি। বাবার নিজের সম্পত্তি বলতে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স-এর পলিসি ছাড়া আর কিছু নেই।

রজতের কথায় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান নরেন্দ্রনাথ। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—দাদা যে চালাক মানুষ ছিলেন তা আমি জানি। তাঁর সম্পত্তিতে যে আমার কোন দাবি-দাওয়ার পথ তিনি রাখবেন না একথা আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল।

—এ সব বিষয় বাবা বেঁচে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে বুঝাপড়া করলেই ভাল হতো, কাকা। আমাকে এখন ওসব কথা শুনিয়ে কোন লাভ নেই।

—লাভ যে নেই তা আমি ভাল করেই জানি। যাই হোক, ওদিকের সম্পত্তিতে আমার অধিকার না থাকলেও এদিকের সম্পত্তিতে তোমার অধিকার নিশ্চয়ই থাকবে। তবে সেজন্য তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এই তো প্রথম দেশের বাড়িতে এলে। দু-চারদিন থাকো, আমোদ-আহ্লাদ করো, তারপর সব ব্যবস্থাই ধীরে সুস্থে করা যাবে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন্দ্রনাথ আবার বলেন—হ্যাঁ, ভাল কথা! লোকে বলাবলি করছে, তুমি নাকি যতসব ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করবার জন্য উস্কানি দিচ্ছ কথাটা কি সত্যি?

—দেখুন কাকা! এসব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার! আমি এখন সাবালক। সুতরাং আমি কি করি না করি সে সম্বন্ধে আপনার কাছে কোন রকম কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজী নই। তবে জানতে যখন চাইছেন, তাহলে শুনুন। এ অঞ্চলের তরুণদের সঙ্গে আমি আলাপ-পরিচয় করার চেষ্টা করছি একথা সত্যি। তাদের আমি ছোটলোক বলেও মনে করি না। সব মানুষই ভগবানের সৃষ্ট। তাদের মধ্যে ছোটলোক বড়লোক কেউ নেই। মানুষ সবাই সমান।

একটু দম নিয়ে রজত আবার বলে—তাছাড়া, আজন্ম বাংলার বাইরেই কাটিয়েছি। গ্রামের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ তো পাইনি আগে। তাই মনে করছি, যে ক'দিন এখানে আছি, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে ওদের দুঃখ দুর্দশার কথাগুলো জেনে নিতে চেষ্টা করলে ক্ষতি কি?

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন রজতের কথা শুনে। বেশ একটু কড়া সুরেই তিনি বলে ওঠেন—ক্ষতি যে কি তা তোমার

মত দু'পাতা ইংরেজী-পড়া ছেলের বুঝবার ক্ষমতা নেই। ক্ষতি হচ্ছে জমিদার বংশের সম্মান আর প্রতিপত্তির।

—কি করে?

—কি করে, শুনবে? ওরা যদি দেখে বা বুঝতে পারে যে জমিদার বাড়ির মানুষ আর ওরা সমান, তাহলে কি জমিদাররা ওদেরই টাকায় ওদেরই মাথার ওপর বসে কর্তৃত্ব করতে পারে? ওরা যদি একযোগে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে, তাহলে জমিদারের জমিদারি চাল যে দুদিনেই ধুলোয় মিশে যাবে! এসব কথা যে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে এ ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু তোমার চালচলন দেখে আমি আর না বলে থাকতে পারলাম না।

এক দমে এতগুলি কথা বলে ফেলে নরেন্দ্রনাথ উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন। তাবপর একটু সুস্থ হলে তিনি আবার বলেন—জমিদারি পরিচালনার গোপন কথাটাও বোধ হয় তোমার জানা নেই, তাই না?

—না। জ্ঞান হবার পর থেকে স্কুল আর কলেজের পড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ওসব গোপন কথা নিয়ে ভাববার মত সুযোগ আমার ছিল না। যাই হোক, গোপন কথাটা দয়া করে বলে দিন আমায়। ওটা জানা থাকলে ভবিষ্যতে কাজ করবার পক্ষে সুবিধে হবে আমার।

নরেন্দ্রনাথের মনে হয়, ঔষধ ধরেছে। তাই কতকটা খুশি মনেই তিনি বলেন—যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে প্রজাদের মনে সব সময় ভয় আর ভক্তি জাগিয়ে রাখতে পারাটাই হ'ল জমিদারি পরিচালনার আসল গোপন কথা। এই যে ঠাট, বনিয়াদী চাল, পাইক, বরকন্দাজ, আসা-সোটা, বন্দুক-তলোয়ার—এ সবই হচ্ছে ওদের মনে ভয় জাগিয়ে রাখবার ব্যবস্থা। আবার পূজো পার্বণে ধুমধাম করা, কাঙালী-ভোজন, মাঝে মাঝে প্রজাদের ডেকে খাওয়ানো, দুএকজনকে খাজনা মাপ দেওয়া—এগুলোও হচ্ছে ভক্তি আদায় করবার উপায়। বুঝলে বাবাজী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকটা বুঝেছি। আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি।

—যাচ্ছো? আচ্ছা যাও। তবে কথাগুলো মনে রেখো।

"নিশ্চয়ই রাখবো" বলে রজত উঠে পড়ে সেখান থেকে।

॥ তিন ॥

কিছুদিন পরের কথা।

রজত এখন রীতিমত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে গ্রামের তরুণদের কাছে। ওদের মন জয় করতে প্রথমটা বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল তাকে। ছেলেরা তাকে দেখলেই দূরে সরে যেতো। ডাকলেও কাছে আসতে চাইতো না। উপযাচক হয়ে কথা বলতে গেলে তারা কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ব্যবহার করতো।

ছেলেদের ব্যবহার দেখে সে বিরক্ত হতো, দুঃখিতও হতো ওদের সন্দেহপ্রবণতা দেখে।

সে বুঝতে চেষ্টা করতো কেন ওরা পরিহার করে চলতে চায় তাকে। অনেক ভেবে চিন্তে ওদের মন জয় করার এক সুন্দর পথ আবিষ্কার করে সে। তার মনে হয় খেলা-ধুলোর ভিতর দিয়ে ওদের মন বশ করতে পারা যাবে। এই কথা মনে হতেই সে কাজে লেগে যায়। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে জমিদারির খাস দখলে কিছু পতিত জমি ছিল। সেই পতিত জমিতে একটা ফুটবল গ্রাউণ্ড তৈরি করে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলোয় মেতে যায় সে এবং খেলার মাধ্যমে অচিরেই সে ওদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

এরপর সে ঐ গ্রাউণ্ডের পাশে একটা ক্লাব ঘরও তৈরি করে, ছোটখাট একটা লাইব্রেরীও খোলা হয় ঐ ক্লাব ঘরে। এই লাইব্রেরী

আর ফুটবল ক্লাবের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত ছেলেদের মন জয় করে সে। ওরা তাকে রজতদা বলে ডাকতে শুরু করে।

প্রতিদিন সকালে গ্রামের তরুণরা এসে জমায়েত হয় লাইব্রেরীতে। রজত তাদের খবরের কাগজ পড়ে শুনায়। বিকেলের দিকে চলে খেলাধুলো আর ব্যায়াম। একদল ফুটবল খেলে আর অন্যেরা করে ব্যায়াম। রজত নিজেই তাদের ব্যায়াম শিক্ষা দেয়। লাঠি আর ছোরা খেলাও শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যায়ামের অঙ্গ হিসেবে।

বলতে ভুলে গেছি, কলেজে পড়াশুনার সময় শরীর-চর্চাতেও রজত বিশেষভাবে নাম করে।

সন্ধ্যার পরে লাইব্রেরীতে বই বিলি চালু হয়। যারা একটু লেখাপড়া জানে তাদের নানারকম বই পড়তে দেয় রজত।

শুধু তাই নয়, গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগের কথাও রজত ঐ লাইব্রেরীতে বসে শোনে এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিকারের চেষ্টা করে। এছাড়া কারো বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলেও রজত এগিয়ে যায় সাহায্য করতে। রোগ কঠিন হলে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে ক্লাবের ছেলেদের সাহায্যে।

এইসব কারণে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে সে।

ক্লাবের ছেলেদের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতেও চেষ্টা করে রজত। এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সভা করে সে। সভায় বক্তৃতা দিয়ে সে দেশের সত্যিকারের অবস্থা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে শ্রোতাদের।

যেদিনের কথা বলা হচ্ছে, সেদিনও রজত বক্তৃতা করছিল ক্লাবের ছেলেদের সামনে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—'জমিদারি'।

রজত বলে—"...আগের দিনের আধা-স্বাধীন সামন্ত-প্রথাকে নিজেদের স্বার্থে লাগাবার উদ্দেশ্যেই জমিদারি-প্রথা চালু করে বিদেশী সরকার। ওরা চেয়েছিল, রাষ্ট্র-ক্ষমতার চাবিকাঠি নিজেদের

হাতে রেখে কতকগুলো তাঁবেদার সৃষ্টি করতে। এইসব তাঁবেদারের সাহায্যেই শাসন ও শোষণ চালাবার মতলব করেছিল ওরা। তাছাড়া কোটি কোটি মানুষের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অসুবিধাও ছিল জমিদারি সৃষ্টির আর একটি কারণ। ওরা তাই সহজে এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে খাজনা আদায়ের জন্য সারা দেশকে কতকগুলি পরগণায় ভাগ ক'রে প্রত্যেক পরগণার জন্য একজন করে জমিদার নিযুক্ত করে। সেই থেকেই জমিদারশ্রেণী সাধারণ প্রজাদের ওপর মুকুটহীন রাজা হয়ে বসে। কারণে অকারণে ওরা জুলুম আর পীড়ন চালাতে থাকে ওরা প্রজাদের ওপর। কোনরকম পরিশ্রম ক'রে বা মূলধন খাটিয়ে ব্যবসায় করে টাকা রোজগার করতে হয় না এদের। অনায়াসলব্ধ আয়ের ফলে এরা গা ঢেলে দেয় বিলাস-ব্যসনে। দেশের কিসে উন্নতি হয়, কি করলে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়, শিল্প-বাণিজ্য, চাষ-আবাদের উন্নতি কি করে করা যায় এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বাজে কাজ না করে এরা শুধুই চিন্তা করতে থাকে, কিভাবে জমিদারির আয় আরও বাড়ানো যায়।

অলস মস্তিষ্কে শয়তান বাসা বাঁধে। ক্ষমতা এবং টাকা অনায়াসে লাভ ক'রে এরা হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়পরায়ণ। জমিদারদের সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হলে দেখতে পাওয়া যাবে কত অগণিত কুলবধুর সতীত্ব নষ্ট করেছে এরা, কত সহস্র সহস্র কুমারী মেয়ের ওপর এরা করেছে বলাৎকার।

নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের ভিটেছাড়া করেছে এই জমিদারশ্রেণী।

বক্তৃতার শেষে রজত বলে, আমার লজ্জা হয় এই ভেবে যে, আমিও এই জমিদারশ্রেণীরই একজন। অবশ্য জন্মের ওপরে মানুষের কোন হাত থাকে না। আমারও তাই ও-ব্যাপারে কোন হাত নেই। তবে এইটুকু আভাস আমি তোমাদের দিতে পারি যে, জমিদারিতে আমার অংশ আলাদা করে নেবার পর আমি সে জমিদারির আয় কিছুই নিজের ভোগে লাগাবো না। লাটের খাজনা আর

নিজেদের নিতান্ত প্রয়োজনের মত টাকা ছাড়া বাকি টাকা সবই আমি ব্যয় করব গ্রামের উন্নতির জন্য।..."

রজতের বক্তৃতা শেষ হলে বিজয় সরকার নামে একটি তরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বলে আমি একটা কথা বলবো, রজতদা!

—নিশ্চয়ই। কি বলবে, বলো!

—কথাটা যদি আপনাদের বাড়ির কোন লোকের সম্বন্ধে হয়, তাহলে রাগ করবেন না তো?

—রাগ করবো! না বিজয়। রাগ আমি করব না। তুমি যা বলতে চাও নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে বলতে পার।

—ছোটবাবুর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা শুনেছেন কি?

—ছোটবাবু! তার মানে সতু দা? কেন, কি করেছেন তিনি?

—কি করেননি তাই বলুন। কিছুক্ষণ আগেই আপনি বললেন যে, অগণিত কূলবধুর সতীত্ব নষ্ট করেছে জমিদাররা। সতু বাবুও ঐ কাজে বিশেষ পটু।

—এ কথা এতদিন বলোনি কেন?

—বলিনি, তার কারণ, আপনার আজকের বক্তৃতা শোনবার আগে পর্যন্ত আমরা আপনাকে নিজের লোক বলে ভাবতে পারিনি। আমি সত্যি কথা বলছি বলে যেন অপরাধ নেবেন না, রজতদা।

—না, না, অপরাধ নেব কেন? আমি যদি এর আগে তোমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে না পেরে থাকি, সে দোষ তোমাদের নয়, সে দোষ আমার। কিন্তু ভাই, এখন আমাকে তোমরা নিজের লোক বলে মনে করতে পারবে তো?

রজতের কথার উত্তরে চাটুজ্জে বাড়ির সলিল বলে—সত্যিই রজতদা, এতদিন আমরা মন খুলে মিশতে সাহস পাইনি আপনার সঙ্গে।

রজত হেসে বলে—এখন থেকে পারবে তো?

এর উত্তরে সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—নিশ্চয়ই। আজ থেকে আপনি আমাদের নিজেদের লোক।

সবার কাছ থেকে সমবেতভাবে স্বীকৃতি লাভ করবার পর রজত বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, বিজয়, যে কথা আরম্ভ করেছিলে এইবার বোধহয় আর কোন বাধা নেই সে কথা বলবার।

বিজয় বলে—না রজতদা, আর কোন বাধা নেই। তাছাড়া ছোটবাবুকে শায়েস্তা করবার মত ক্ষমতা আপনি ছাড়া আর কারই বা আছে? সত্যি কথা বলতে কি রজতদা, ছোট বাবুর ভয়ে গ্রামের বউ-ঝিদের বাড়ির বার হওয়াই দায় হয়ে উঠেছে। কারো উপর একবার তাঁর কু-নজর পড়লে আর তার রক্ষা নেই। যেমন করে হোক্ তিনি তার সর্বনাশ করে ছাড়েন।

বিজয়ের এই অভিযোগ ক্লাবের অন্যান্য সভ্যরাও সমর্থন করে। রজত তখন ওদের কথা দেয় যে, আজ থেকেই সে তার সতুদার ওপরে নজর রাখবে।

ঐ দিনই বিকেল।

খেলা শেষে রজত একা একা জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে ফিরে আসছিল, আর সত্যরঞ্জনের কথা চিন্তা করছিল। এই সময় সামনের দিক থেকে সত্যরঞ্জনকে আসতে দেখে সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

একটু পরেই সত্যরঞ্জন তার সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রজত বলে—সতুদা একটু দাঁড়ান।

রজতের কথা শুনে সত্যরঞ্জন বলে—কেন বলো তো?

কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসে।

রজত বলে—আপনি মদ খান, সতুদা! ছিঃ!

জড়িতকণ্ঠে সত্যরঞ্জন বলে—ছিঃ মানে? মদ কে না খায়? এ রকম ভাল জিনিস ছুনিয়ায় আর আছে নাকি? খেয়েই দেখো না একদিন।

—থাক্, আমাকে আর মদ খাওয়াবার জন্ত ওকালতি করতে হবে না। যাহোক, যে কথা বলব বলে আপনাকে ডেকেছি শুন্থন।

—কি বলবে বলো। তবে একটু তাড়াতাড়ি। আর একটু সর্ট-এ বলতে চেষ্টা ক'রো।

—হ্যাঁ, সর্ট-এই বলছি। ভবিষ্যতে কোন মেয়ের দিকে কু-নজরে তাকাবার চেষ্টা করবেন না।

নেশা-জড়িত কণ্ঠে সত্যরঞ্জন বলে—তার মা....নে?

—মানেটা কি বুঝতে পারছেন না নাকি?

—হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় বলো। কারো হেঁয়ালি শুনবার মত সময় আমার নেই।

—নেই বুঝি? আচ্ছা বেশ, তাহলে সোজা করেই বলছি। কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনার গুণের কথা সবই আমি শুনেছি। আজ তাই ভাল কথায় সাবধান করে দিচ্ছি, কিন্তু এর পরেও যদি কোনদিন কিছু শুনি তাহলে খুব ভাল হবে না।

—ভাল হবেনা...মানে? কি করবে তুমি আমার?

—কি করবো শুনবেন? আপনাকে তাহলে এমন শিক্ষা দেবো যে, জীবনে আর কোন মেয়ের দিকে কু-দৃষ্টি দেবার সাধ হবে না, বুঝলেন।

—কি বললি! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! তোর ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই আমি একদিনে ভেঙে দিতে পারি, তা জানিস?

—ভদ্রভাবে কথা বলতে চেষ্টা করো, সতুদা।

—কি বললি হারামজাদা! আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে জানি না? আমাকে ভদ্রতা শেখাতে চাস্ তুই? তবে নিজে আগে শিখে নে—

এই কথা বলেই সত্যরঞ্জন রজতের গালে একটা চড় কসিয়ে দেয়।

চড় খেয়ে রজত ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। বাঘের মত লাফ দিয়ে সে সত্যরঞ্জনকে আক্রমণ করে, এবং মুহূর্তের মধ্যে যুযুৎসুর প্যাঁচ মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়।

সত্যরঞ্জন বাধা দিতে চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠে না। দৈহিক শক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে সে তখন আরম্ভ করে গালাগালি অশ্রাব্য ভাষায়।

সত্যরঞ্জনের সেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুনে রজত বলে—তবে রে বদমাস্, আবার গালাগালি করা হচ্ছে? তোর মুখ কি করে বন্ধ করি দ্যাখ।

এই বলে তার বুকের ওপর চেপে বসে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে থাকে সে। কয়েকটা ঘুসি পড়তেই সত্যরঞ্জনের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে।

রক্ত দেখে রজত তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ছাড়া পেয়ে সত্যরঞ্জনও ধরাশয্যা থেকে উঠে, পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুখের রক্ত মুছতে আরম্ভ করে।

রজত বলে—কেমন? শিক্ষা হয়েছে তো? এবারে লক্ষ্মী-ছেলেটির মত বাড়ি যাও। মনে রেখো, ভবিষ্যতে কোন মেয়ের পেছনে লাগলে এর চেয়েও বেশি শিক্ষা দেওয়া হবে তোমাকে।

সত্যরঞ্জন নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে সরে পড়ে রজতের সামনে থেকে।

সে চলে গেলে কিছুই হয়নি এইভাবে রজত আবার এগুতে থাকে রাস্তা দিয়ে।

॥ চার ॥

বাড়ি ফিরতে বেশ একটু রাত হয় সেদিন রজতের।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে, নরেন্দ্রনাথ তখনও জেগে আছেন। রজতের মনে হয়, তার জন্যই কাকা অপেক্ষা করছেন। আসলেও তাই; কারণ, রজতকে দেখেই তিনি বলেন—তুমি একবার আমার ঘরে এসো তো, রজত। বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে।

কাকার এই বিশেষ দরকারটা যে কি তা বুঝতে দেরি হয় না রজতের। মনে মনে হেসে মুখে সে বলে—বেশ। চলুন।

নরেন্দ্রনাথ তখনই রজতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর নিজে আসন গ্রহণ করে রজতকে বসতে বলেন।

রজত বসলে নরেন্দ্রনাথ বেশ একটু গরম সুরেই বলেন—সত্যর গায়ে হাত তুলেছ তুমি?

—হ্যাঁ।

—তোমাকে ওর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

—কি বললেন, পা ধরে ক্ষমা চাইব? কিসের দুঃখে? ক্ষমা যদি কাউকে চাইতে হয় তো ওঁকেই চাইতে হবে।

—তোমার সাহস তো দেখছি কম নয়! আমার মুখের ওপর কথা বলবার স্পর্ধা তোমার কোত্থেকে হ'ল?

—এর মধ্যে তো স্পর্ধার কথা কিছু নেই, কাকা! সতুদাকে কিসের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে শুনলে মাথা নিচু হয়ে যাবে আপনার। যাহোক বিচার করতে যখন বসেছেন সেক্ষেত্রে দু' পক্ষের বক্তব্য শুনে তারপর বিচার করলেই ভাল হত?

রজতের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন—শাস্তি দেবার তুমি কে হে ছোকরা? তোমার

দেখছি বড্ড বাড় বেড়েছে। তোমাকে কি করে ঠাণ্ডা করতে হয় সে ওষুধ আমার জানা আছে, বুঝলে? কাল থেকে আর একটি পয়সাও তুমি যাতে না পাও আমি তার ব্যবস্থা করছি। খাজাঞ্চী বাবুকে আমি আজই হুকুম দিয়ে রেখেছি, তোমাকে যেন একটি পয়সাও আর না দেওয়া হয়।

—বেশ। আমিও কাল লিখিতভাবেই হুকুম দেব খাজাঞ্চীবাবুকে, দেখি তিনি কি করে টাকা না দেন।

—কি বললে? লিখিতভাবে হুকুম দেবে? বেশ, তাই দিও তাহলে। তবে এ বাড়িতে থেকে নয়। এ বাড়ি থেকে এই মুহূর্তে তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

—বাড়ি একা আপনার নয় সে কথাটা ভুলে যাবেন না, কাকাবাবু। এ বাড়ির অর্ধেকের মালিক আমিও। কার সাধ্য আমাকে এ বাড়ি থেকে বের করে?

—এই কথা? বেশ তাহলে দেখ কে বের করে?

এই বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেন—চৌবে!

নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে দরোয়ান রাম আওতার চৌবে ঘরে ঢুকে লাঠি ঠুকে অভিবাদন করে বলে—হজৌর!

—ইস্‌কো নিকাল দো কোঠি সে!

নরেন্দ্রনাথের হুকুম পেয়ে চৌবে মহারাজ রজতের সামনে গিয়ে বলে 'চলিয়ে'। এ অপমান সহ্য করতে পারে না রজত। সে তখন আহত ব্যাঘ্রের মত একলাফে চৌবে মহারাজকে আক্রমণ করে এক ঝট্‌কায় তার হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে নেয়।

তারপর লাঠিখানা বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে এমন এক ঘুষি মারে তার পেটে যে, এক ঘুষিতেই চৌবেজী চোখে সরষে ফুল দেখে, ধানের বস্তার মত ধপাস করে মেঝের ওপর পড়ে যায় সে।

রজত চৌবে মহারাজের ভূপতিত দেহটির দিকে একবার তাকিয়ে নরেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বলে—আপনার আর কোন চৌবে,

দৌবে বা মিশির থাকলে তাদেরও ডাকতে পারেন। দেখবেন এক একটি ঘুষিতেই তারা কেমন করে খাবি খায়।

চোখের সামনে পালোয়ান চৌবে মহারাজের দুর্দশা দেখে নরেন্দ্রনাথ রীতিমত ভীত হয়ে ওঠেন। আর কাউকে ডাকবার মত সাহস আর তাঁর হয় না।

নরেন্দ্রনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে রজত বলে—এই মুহূর্তে বাড়ির অর্ধেক অংশ খালি করে দিন। আমি আর আপনার সঙ্গে থাকতে রাজী নই।

এই বলে হাতের লাঠিখানা হেলায় দূরে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে আবার বলে যায়—তাছাড়া জমিদারির অংশ কি করে আদায় করতে হয় সে কায়দাও আমার জানা আছে। সময়ে দেখতে পাবেন।

বাড়ি থেকে বের হয়ে রজত সোজা চলে যায় ক্লাব ঘরে। সেখানে একখানা ক্যাম্পখাট সে কিনে রেখেছিল। সেই ক্যাম্পখাটে শুয়েই রাত কাটিয়ে দেয় সে। রাত্রে আর তার খাওয়া হয়না সেদিন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয় রজতের। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা প্রায় আটটা বাজে। এত বেলা পর্যন্ত কোনদিন সে ঘুমায় না।

তার মনে হয়, এখুনি একবার বাড়ি যাওয়া দরকার, খাজাঞ্চীবাবুকে লিখিতভাবে হুকুম দিতে হবে। তাছাড়া বাড়ির অর্ধেক অংশ তাকে দখল নিতে হবে। এই কথা মনে হতেই সে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ায়। চলতে চলতে তার মনে হয় নরেন্দ্রনাথের আস্ফালনের কথা। হয়তো তিনি তাকে বাধা দেবেন বাড়ি ঢুকতে। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনে এসে হাজির হয় সে।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখা হয়ে যায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি

তখন সদর দরজার সামনেই পায়চারি করছিলেন। রজতকে দেখে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি বলেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলে রজত? তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! যাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও গে।

নরেন্দ্রনাথকে ভোল পাল্টাতে দেখে অবাক হয়ে যায় রজত। তার মনে হয়, এর পেছনে হয়তো কোন গভীর মতলব আছে। কিন্তু মতলব যে কি, তা সে বুঝে উঠতে পারে না।

রজতকে চুপ করে থাকতে দেখে নরেন্দ্রনাথ বলেন—কি ব্যাপার! কথা বলছ না যে!

নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে কি বলা যায় ভেবে ঠিক করতে পারে না রজত। কিন্তু একটা কিছু না বললেও চলে না মনে করে সে বলে—আমি ভাবছি, আজ থেকে আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে নেব। আপনি দয়া করে পূব দিকের মহলটা খালি করে দেবার ব্যবস্থা করুন।

রজতের কথা শুনে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে নরেন্দ্রনাথ বলেন—পাগল ছেলের কথা শোন! আমি তোমার গুরুজন। গুরুজনের কথায় কি রাগ করতে আছে! রাগের মাথায় আমি যদি দু'একটা অন্যায় কথা বলেই থাকি, কিন্তু তোমার কি এইভাবে শোধ নেওয়া উচিত!

—উচিত অনুচিতের কথা হচ্ছে না, কাকা। আমি জানতে চাই, আমাকে মহলটা খালি করে দেবার ব্যবস্থা হবে কি?

—হবে মানে? সে ব্যবস্থা আগেই হয়ে গেছে। রাত্রেই পূব দিকের মহল খালি করে দিয়েছি আমি। কিন্তু কথা তা নয়। কথাটা হচ্ছে তুমি যখন একা এসেছ এ অবস্থায় তোমাকে আমি ওসব রান্না-বাড়ার হাঙ্গামায় ফেলতে চাইনে। বৌদিরা যদি কখনও বাড়িতে আসেন তখন না-হয় আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করো। এখন যেভাবে চলছে সেইভাবেই চলুক। কেমন?

রজতেরও খুব আপত্তি ছিল না এ ব্যাপারে, বিশেষ করে এখুনি তার কিছু খাওয়াও দরকার। সে তাই খুশি মনেই বলে—আপনি যখন বলছেন, বেশ, তাহলে তাই হোক।

বাড়িতে ঢুকে রজত দেখতে পায় সত্যিই পূব দিকের মহলটা তার জন্য খালি করে রাখা হয়েছে। এমনকি শোবার ঘর, বৈঠকখানা, স্নানঘর ইত্যাদিও ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। শোবার ঘরের খাটে পরিষ্কার বিছানাও পেতে রাখা হয়েছে। শোবার ঘর আর বসবার ঘরে আসবাবপত্রও কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে।

ব্যবস্থা দেখে মনে মনে খুশি হয় রজত। জামা-কাপড় ছেড়ে সে বসবার ঘরের একখানা আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে দেয়।

একটু পরেই বাড়ির ঝি সতুর মা রেকাবিতে করে কিছু লুচি, সন্দেশ আর এক কাপ চা একখানা টিপয়ের ওপর রাখে, টিপয়খানা তার সামনে এগিয়ে দেয়।

রজত তখন কালবিলম্ব না করে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লেগে যায়।

রজতকে গোগ্রাসে গিলতে দেখে সতুর মা বলে—আর কয়েকখানা লুচি আনব কি দাদাবাবু?

রজত বলে—আনো!

পাঁচ

রজত যখন খুশি মনে লুচি সন্দেশ খাচ্ছে, সেই সময় সত্যরঞ্জন তার ঘরে বসে রজতের কথাই চিন্তা করছে। তার মনের মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বেলে দিয়েছে রজত। গত সন্ধ্যার সেই অপমানের কথাই বার বার মনে হচ্ছে তার। বাবার কাছে নালিশ করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি সে। মাঝখান থেকে তার বাবাকেও অপমানিত হতে হয়েছে ওর কাছে। রজতের ভয়ে তার বাবা বাধ্য হয়েছেন পূবের মহলখানি খালি করে দিতে সত্যিই কি বাবা ভয় পেয়েছেন? নিশ্চয়ই। নইলে সুড় সুড় করে ওর কথামত কাজ করছেন কেন? কিন্তু এভাবে জিতে যেতে ওকে দেওয়া হবে না। কিছুতেই না।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে সত্যরঞ্জনের। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে প্রথমেই তার মনে হয় রজতকে হত্যা করবার কথা। অনেকদিন আগে সে একজন লোককে পায়রা মারতে দেখেছিল। হাতের আঙুলের মধ্যে পায়রার গলাটা চেপে ধরে সজোরে হাতটা ছুঁড়ে দেয় লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে পায়রাটার দেহ গলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সত্যরঞ্জনের ইচ্ছা ঠিক ঐভাবে রজতের গলাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ওর দেহে যে অসুরের মত শক্তি!

রজতের দৈহিক শক্তির কথা মনে হতেই মুসড়ে পড়ে সত্যরঞ্জন। তার নিজের হাতে ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবার কল্পনা আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পাঁচু বাগদীর কথা। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। পাঁচু বাগদীকে দিয়েই হত্যা করা হবে ওকে। শ' খানেক টাকা ধরে দিলেই চুকে যাবে। কিন্তু...

আবার একটা বিরাট 'কিন্তু' এসে সত্যরঞ্জনের মনটাকে আচ্ছন্ন

করে ফেলে। পাঁচু যদি কাজ হাঁসিল করতে না পারে? ও যদি রজতের কাছে মার খেয়ে ফিরে আসে? অসম্ভব নয় কিছুই। তাছাড়া, খুনোখুনি ব্যাপারে মাথা দিলে কে জানে কোন্ দিক দিয়ে কি ফ্যাসাদ এসে হাজির হয়। না, ও মতলব চলবে না। ওকে জব্দ করতে হবে অন্য পথে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। ও বলেছে যে, ভবিষ্যতে কোন মেয়ের দিকে কুদৃষ্টি দিলে আমাকে নাকি শিক্ষা দেবে। দেখি ও আমাকে কি করতে পারে? ছোঃ! ও দেবে আমাকে শিক্ষা! যেন ধর্ম্মপুত্তুর, যুধিষ্ঠির এসেছেন। মেয়েদের রক্ষা করবে ও। দেখি কি ভাবে করে!

মেয়েদের কথা মনে হতেই তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে দেবেন দাসের ষোড়শী মেয়ে কল্যাণীর মুখখানা। প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দর এই মেয়েটির প্রতি অনেকদিন থেকেই সত্যরঞ্জনের লোভ ছিল। গ্রামের কুটনী বুড়ি পদীর মাকে দিয়ে অনেকবারই সে চেষ্টা করছে কল্যাণীকে হাত করতে। কিন্তু প্রতিবারেই কল্যাণী তাকে অপমান করে দূর করে দিয়েছে।

আজ হঠাৎ সত্যরঞ্জনের মনে হয় কল্যাণীকে চুরি করে আনতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। রজতও জব্দ হবে আবার কল্যাণীকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু কি করে চুরি করা যায় মেয়েটিকে! দেবেন দাসকে যদি দু'চার দিনের জন্য বাইরে পাঠানো যায় তাহলে সহজেই কাজ উদ্ধার করা যায়। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। ওকে চুরি কেস-এ ফেলে হাজতে বন্ধ করতে হবে। চোরাই মাল ঘরে রেখেছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দিতে হবে ওকে।

এই দুষ্টবুদ্ধিটা মাথায় আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। তারপর আলনা থেকে একটা জামা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

এর ঘণ্টাখানেক পরে সত্যরঞ্জনকে দেখা যায় গঙ্গারামপুরের

পিয়ার মহম্মদের বাড়িতে। পিয়ার মহম্মদের ঘরের দাওয়ায় বসে অনুচ্চকণ্ঠে আলাপ আলোচনা চলে দুজনের মধ্যে।

আলাপ-আলোচনাটা কি বিষয়ে হচ্ছে সে কথা বলবার আগে পিয়ার মহম্মদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করছি। পিয়ার মহম্মদ ও তল্লাটের নাম-করা চোর। ছয়বার জেল খেটে এসেছে সে। বর্তমানে ৪৬৫ ধারার নজরবন্দীরূপে নিয়মিত থানায় হাজিরা দিচ্ছে।

এহেন বদমাসের সঙ্গে সত্যরঞ্জন কি বিষয়ে শলাপরামর্শ করতে এসেছে জানা যাক এবার।

সত্যরঞ্জনের কি একটা কথার উত্তরে পিয়ার মহম্মদকে বলতে শোনা যায়—বলেন কি ছোটবাবু! আমাকে যে তাহলে কমপক্ষে দুটি বছর জেলের ঘানি টানতে হবে।

সত্যরঞ্জন বলে—তা হয়তো হবে। কিন্তু জেল খাটার ক্ষতি যদি আমি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিই! মনে কর, আমি যদি তোমাকে নগদ পাঁচ শ' টাকা দিই। তাহলে হবে তো?

—মোটে পাঁচ শ'। না ছোটবাবু, অতো কম টাকায় আমি পারব না। চুরি না করেও যদি চুরির দায়ে জেল খাটতে হয়, তাহলে কমসে কম হাজার টাকা আমার চাই।

—ও, তুমি বুঝি আমার গরজ ঠাউরেছো! যাই হোক তোমাকে আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি। মোট সাত শ' টাকা তুমি পাবে। এর বেশি দাবি করলে আমার কাছে পাবে না।

সত্যরঞ্জনের কথায় পিয়ার মহম্মদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—বেশ, আমি সাত শ'তেই রাজী আছি। তবে বাবু, টাকাটা আমাকে অগ্রিম দিতে হবে। জেলে যাবার আগে দিন কয়েক ফুর্তি করে যেতে চাই আমি।

—বেশ। কবে চাও টাকা?

—কাল সকালেই দিন না! আমি তাহলে দিন কয়েকের জন্ম ঘুরে আসি।

—কোথায় যেতে চাও তুমি ?

—এজ্ঞে, সে কথা নাই বা শুনলেন।

—না, পিয়ার মহম্মদ। তোমার ঠিকানাটা আমার জানা দরকার। ফূর্তির চোটে তুমি যদি আসল কাজ ভুলে যাও তখন আমাকে গিয়ে ধরে আনতে হবে তো তোমাকে।

পিয়ার মহম্মদের মনে হয় ছোটবাবু, ঠিক কথাই বলেছেন। সে তাই সামান্ত একটু ইতস্তত্ত করে বলে—কলিকাতায় একশ' তের নম্বর ইমাম বক্স লেনে গিয়ে মনোরমার ঘরে খোঁজ করলেই আমাকে পাবেন। ওর কাছে গিয়ে সন্তোষ দাসের খোঁজ করবেন। মনে থাকবে তো ?

সত্যরঞ্জন হেসে বলে—ওখানে বুঝি তোমার নাম সন্তোষ দাস ?

পিয়ার মহম্মদ বলে—শুধু কি সন্তোষ দাস ? আরও আছে গোটা আষ্টেক নাম! সবগুলো আবার মনেও নেই এখন। এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেঁ হেঁ করে হেসে ওঠে।

সত্যরঞ্জন বলে—আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি। কাল সকালেই তোমার টাকা নিয়ে আসছি। যাবার সময় আর একটা কথা বলে যাই! তুমি যদি আমার সঙ্গে বেইমানি করবার চেষ্টা কর তাহলে তোমার ভিটে-মাটি জরু-গরু সবই শেষ হয়ে যাবে। বুঝেছ ?

পিয়ার মহম্মদ বলে—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, ছোটবাবু। চোরেরা তাদের কথা ঠিক রাখে। 'চোরকা বাত, হাতিকা দাঁত।' একটু নড়চড় নেই।

পিয়ার মহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সত্যরঞ্জন সোজা চলে যায় পঞ্চা দত্তর বাড়িতে। এই পঞ্চা দত্ত ওরফে পঞ্চানন দত্ত সত্যরঞ্জনের অন্যতম পিয়ায়ের লোক। আগে অবশ্য পেয়ারের লোক সে ছিল না। কিন্তু নিজের পুত্রবধূর সঙ্গে ছোটবাবুর পরিচয় করিয়ে দেবার পর থেকেই হাওয়া বদলে যায়। ছোটবাবু এখন প্রায়ই আসে তার বাড়িতে। প্রথম প্রথম অবশ্য পঞ্চার ছেলে সনাতন একটু-

আধটু আপত্তি করতো ; কিন্তু সত্যরঞ্জন তার গাঁজা খাবার জন্য মাসে দশটাকা হিসেবে বরাদ্দ করে দেবার পর থেকে সেও হঠাৎ বাপের মতই ছোটবাবুর একান্ত বশ হয়ে ওঠে।

সত্যরঞ্জন ভাল করেই জানে যে, গোটা কয়েক টাকা হাতে গুঁজে দিলে পঞ্চাকে দিয়ে সব কিছু করানো যায়। পঞ্চাও জানে যে, ছোটবাবুর নেক নজর বজায় রাখতে পারলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। আর, লোকসান করবার মত মানুষই পঞ্চা নয়।

তাই সত্যরঞ্জন যখন তার বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়ে "পঞ্চা বাড়ি আছ নাকি" বলে ডাক দেয়, তখন সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে—"আসুন ছোটবাবু। ভিতরে এসে বসুন।"

ঘরের ভিতরে গিয়ে চৌকির ওপরে বসে পড়ে সত্যরঞ্জন।

পঞ্চা দত্ত বলে, "বৌমাকে ডেকে দেব, বাবু?"

—না। আমি আজ এসেছি তোমার কাছে।

পঞ্চা ভেবেই ঠিক করতে পারে না যে, তার সঙ্গে আবার ছোটবাবুর কি এমন কাজ থাকতে পারে! সে তাই বোকার মত জিজ্ঞেস করে—কি বললেন, ছোটবাবু? আমার কাছে এসেছেন?

পঞ্চার মনের কথা বুঝতে দেরি হয় না সত্যরঞ্জনের। সে তাই মৃদু হেসে উত্তর দেয়—হাঁ পঞ্চা, আজকের কাজটা তোমার সঙ্গেই। কাজটা ঠিকমত করতে পারলে নগদ একশ' টাকা বক্সিস্ পাবে, বুঝলে?

—আজ্ঞে, আপনার খেয়েই তো বেঁচে আছি, ছোটবাবু। কি করতে হবে দয়া করে বলুন।

—করতে বিশেষ-কিছু হবে না। শুধু একবার থানায় একটা এজাহার দিতে হবে তোমার বাড়িতে চুরি হয়েছে।

—বলেন কি ছোটবাবু! সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

—গ্রামের লোকেরা হয়তো করবে না। কিন্তু পুলিস আর আদালত ঠিকই বিশ্বাস করবে।

—কি বলে এজাহার দিতে হবে আমাকে ?

—তুমি বলবে তোমার বাড়িতে চুরি হয়েছে। চোর সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে তোমার বৌমা আর স্ত্রীর গহনাপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। তুমি আরও বলবে যে এ চুরির জন্য তুমি গঙ্গারামপুরের পিয়ার মহম্মদকে সন্দেহ কর।

—মিথ্যে এজাহার দিয়ে কোন গোলমালে পড়বো না তো, ছোটবাবু ?

—না, না। কোন ভয় নেই তোমার। হ্যাঁ ভাল কথা, কমলার কি কি গহনা আছে বলতো ?

—গহনা আর কোথায় আছে, ছোটবাবু। ঐতো মাত্র হাতে দুগাছা চুড়ি আর কানের দুটো দুল।

—আচ্ছা বেশ। তুমি তোমার বৌমার কাছ থেকে তার কানের দুল দুগাছা চেয়ে নাও আমার নাম করে। ও দুটো আমি নিয়ে যাবো।

—নিয়ে যাবেন, ছোটবাবু !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যাবো। কোন ভয় নেই তোমাদের। দুল দুগাছা আমি বেচে খাব না। পিয়ার মহম্মদের বাড়ি খানাতল্লাসি করবার সময় চোরাই মাল কিছু থাকা চাই তো সেখানে !

—আপনি কি বলছেন আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না, ছোটবাবু। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করেই বলুন না।

– বেশ, তাহলে পরিষ্কার করেই বলছি শোনো। তোমার বাড়িতে চুরি হয়েছে এই এজাহার দেবার পরেই পিয়ার মহম্মদের বাড়ি খানাতল্লাসী করবে পুলিস। তল্লাসীর সময় তোমার বৌমার দুল দুগাছা পাওয়া যাবে।

—তারপর ?

—তারপর পিয়ার মহম্মদকে পুলিশ হাজতে নিয়ে যাবে। হাজতে যাবার সময় সে পুলিসের কাছে স্বীকার করবে যে, তোমার স্ত্রীর হারগাছা সে দেবেন দাসের কাছে বিক্রি করেছে। বুঝতে পেরেছ ?

—বুঝেছি বৈকি ছোটবাবু। কিন্তু দেবেন দাসের বাড়িতে যদি চোরাই মাল না পাওয়া যায় তাহলে যে সব মতলবই ভেস্তে যাবে আপনার!

—আমার মতলব এতো সহজে ভেস্তে যায় না পঞ্চা। তুমি দেখে নিও। খানাতল্লাসীর সময় দেবেন দাসের বাড়ি থেকে তোমার স্ত্রীর হাড়গাছা ঠিক বেরিয়ে পড়বে।

—আমার স্ত্রীর তো কোন হার নেই!

—না থাকলেও কোর্টে তোমাকে বলতে হবে যে, তোমার স্ত্রীর হার চুরি গেছে।

—দেখবেন ছোটবাবু। শেষ পর্যন্ত মারা না পড়ি।

—কোন ভয় নেই পঞ্চা। আমি তোমার পেছনে আছি সব সময়।

—কিন্তু কল্যাণীকে পেলে আমার কথা কি মনে থাকবে আপনার? তাছাড়া এত সব করে আমার কি লাভ হবে তাও তো বুঝতে পারছি না। মোটে তো দিচ্ছেন পঞ্চাশটি টাকা!

—ও, এই কথা? আচ্ছা তোমাকে আমি আরও তিনশ' টাকা দেব এই কাজের জন্য। ঐ তিনশ' টাকায় তুমি বিঘে ছয়েক জমি কিনতে পারবে। এখন বল তুমি রাজি আছ কিনা?

—বেশ, আমি তাহলে রাজি আছি। কবে এজাহার দিতে হবে বলুন?

—সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি দুদিন আগে তোমাকে খবর দেব।

—সিঁদ কাটার ব্যবস্থা কিভাবে করা যাবে ছোটবাবু?

—তার মানে? সামান্য একটা সিঁদও কি নিজের হাতে কাটতে পারবে না তুমি?

—বুঝতে পেরেছি ছোটবাবু, আর আমাকে কিছু বলতে হবে না। তবে টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি দেবার চেষ্টা করবেন।

—নিশ্চয়ই করতে হবে। এসব কি ধার রাখলে চলে! টাকা তুমি কালই পাবে। এবার হুল দুগাছা নিয়ে এসো দেখি! আচ্ছা, তার দরকার নেই; তুমি বরং কমলাকেই একবার পাঠিয়ে দাও।

—সেই ভাল, আমি বৌমাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি এখানে। এই বলেই পঞ্চা বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

পঞ্চা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কমলা এসে ঘরে ঢোকে। সত্যরঞ্জনের কাছে এগিয়ে এসে সে বলে- আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথাই শুনেছি।

সত্যরঞ্জন হেসে বলে—যাক্। আমি তাহলে প্রথম থেকে বলবার দায় থেকে রেহাই পেলাম! এবারে দুল দুগাছা খুলে দাও তো সুন্দরী!

—না।

—না মানে?

—না মানে, আমার মত আর একটি মেয়ের সর্বনাশ হতে আমি দেব না। ওসব মতলব তুমি ছাড়।

—অর্থাৎ তোমার ভয় হচ্ছে, এরপর আমি কল্যাণীকে নিয়ে মেতে উঠবো, তোমার দিকে আর ফিরে তাকাব না, এই তো? সে ভয় নেই সুন্দরী। নতুন চালে পেটের অসুখ করে। আমাদের পুরণো চালই ভাল। আর তাছাড়া, তোমার সর্বনাশই বা কি করে করলাম আমি? আমি তো রীতিমত দাম দিয়েই তোমাকে পেয়েছি। তোমার স্বামী দেবতার পাকা এলাউন্স, শ্বশুর দেবতার প্রণামী, তোমার শাড়ি-ব্লাউজ, স্নো-পাউডার—সবে মিলে পাঁচ শ' টাকার বেশি বেরিয়ে গেছে, সে হিসাব রাখ কি?

—"হিসেব রাখতে আমার দায় পড়েছে।" এই বলে কান থেকে দুল দুগাছা খুলে সত্যরঞ্জনের হাতে দিয়ে সে আবার বলে—কাছে টাকা থাকে তো কিছু আমাকে দিয়ে যাও।

—সেকি! তুমি তো আর কখনো টাকা চাওনি।

—চাইনি। না চেয়ে যে ভুল করেছি, এবার তা শোধরাবার চেষ্টা করব। যাহোক, দেবে কিনা বলো?

—তোমাকে না দিলে কি চলে কখনো ! এই নাও।

এই বলে পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে কমলার হাতে দেয় সে।

নোট দুখানা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে কমলা বলে—এই কুড়ি টাকা দিয়েই সম্পর্ক শেষ করতে চাইছো নাকি ?

সত্যরঞ্জন বলে—তোমার আজ হয়েছে কি বলতো ?

—কি আবার হবে ! সবাই যখন যে-যার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন ?

—ও এই কথা ? বেশ, তাহলে তোমার পাওনা কাল পাবে।

—মনে থাকবে তো ?

—নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এখন তাহলে উঠি, কেমন ?

এই কথা বলেই সত্যরঞ্জন উঠে পড়ে চৌকি থেকে।

এরপর এক মাস কেটে যায়।

এই একমাসের মধ্যে সত্যরঞ্জন গোপনে গোপনে কল্যাণী হরণের সবরকম ব্যবস্থাই করে ফেলেছ। পঞ্চা দত্তকে দিয়ে থানায় এজাহার দেওয়া হয়ে গেছে। দারোগাবাবু এসে সরেজমিনে তদন্ত করে গেছেন অকুস্থলে। পিয়ার মহম্মদের বাড়ি খানাতল্লাসী করা হয়েছে এবং যথারীতি তার ঘর থেকে পঞ্চা দত্তের পুত্রবধূর কানের দুল দুগাছা পাওয়া গেছে।

আসামীর বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঘটনার রাত্রে থানার জমাদার রাউণ্ডে এসে তাকে বাড়িতে পায় নাই। এইসব অকাট্য প্রমাণ হস্তগত হওয়ায় দারোগাবাবু পিয়ার মহম্মদকে গ্রেপ্তার

করে থানায় নিয়ে যান এবং যথাবিহিত অন্যান্য মালগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

পিয়ার মহম্মদ প্রথমে কিছুই বলতে চায়নি। কিন্তু দারোগাবাবু যখন তাকে পুলিসী দাওয়াই প্রয়োগ করবার ভয় দেখান তখন সে সুড় সুড় করে সব কথা বলে দেয়। সে বলে যে, পঞ্চা দত্তের বাড়িতে চুরি করে দু'ছড়া হার আর দুটো দুল সে পেয়েছিল। দুল দুগাছা সে তার বিবির জন্যে বাড়িতে রেখে দেয় আর হারছড়া নগদ ষাট টাকায় রায়পুর গ্রামের দেবেন দাসের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

পিয়ার মহম্মদ আরও বলে যে, দেবেন দাসের কাছে এর আগেও কয়েকবার সে চোরাই মাল বিক্রি করেছে। যেদিনের কথা লেখা হচ্ছে. সেইদিন সকালেই পিয়ার মহম্মদ এই স্বীকারোক্তি করে।

চোরের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পেরে দারোগাবাবু রীতিমত খুশি হয়ে ওঠেন। তিনি তখন আর কালবিলম্ব না করে সদলবলে বেরিয়ে পড়েন দেবেন দাসের বাড়ি খানাতল্লাসী করবার উদ্দেশ্যে।

এইসব ব্যবস্থা সত্যরঞ্জন এমনই চাতুর্যের সঙ্গে করেছে যে, রজত ঘুণাক্ষরেও এ-সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেনি। না পারার আরও কারণ হ'ল নরেন্দ্রনাথের স্নেহাধিক্য। সেই ঘটনার পর থেকেই যেন ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। এখন তিনি দিনে তিন চার বার করে রজতের খোঁজ খবর নেন। তার খাওয়া-দাওয়ার দিকে নরেন্দ্রনাথের প্রখর দৃষ্টি এখন। প্রতিদিন পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে সেই টাট্‌কা মাছের ঝোল রজতকে খেতে দিতে বলে রেখেছেন তিনি।

কাকার বর্তমান ব্যবহার দেখে রজতের এখন এই কথাই মনে হচ্ছে যে, সেদিনকার ব্যাপারটা সাময়িক উত্তেজনার বশেই ঘটে গিয়েছিল।

সত্যরঞ্জনের জন্যও দুঃখ হয় রজতের। সে লক্ষ্য করে যে,

সত্যরঞ্জন পারতপক্ষে তার সামনে আসে না। দৈবাৎ কখনও দুজনের দেখা হয়ে গেলেও সত্যরঞ্জন মাথা নিচু করে সরে পড়ে।

রজত ভাবে, সত্যদা নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হয়েছেন। হবেই বা না কেন? হাজার হোলেও বংশের একটা সম্মান আছে তো? চৌধুরী বংশের ছেলে হয়ে তিনি কি কখনও হীন কাজ করতে পারেন? আগে হয়তো কু-সঙ্গে পড়ে দু-একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে তিনি সাবধান হয়ে গেছেন। লজ্জিত হয়েছেন খুবই। নইলে আমার সঙ্গে দেখা হলেই মাথা নিচু করে চলে যাবেন কেন?

এইসব কথা চিন্তা করে তার মনে হয় সে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। নিজের এই কাল্পনিক সাফল্যে সে এমনই মশগুল হয়ে ওঠে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখবার কথা সে ভুলে যায়।

সে তখন উঠে পড়ে লেগে যায় তার লাইব্রেরী আর ক্লাব-এর সংগঠনের কাজে। তার প্রতিষ্ঠিত 'রায়পুর এ্যাথেলেটিক ক্লাবটিও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। এই জনপ্রিয়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে সে লীগ খেলার বন্দোবস্ত করে। প্রতিদিনই একটা করে ম্যাচ চলছে তখন।

যেদিনের কথা বলা হচ্ছে, সেদিনও একটি ম্যাচ খেলার তারিখ ছিল। ম্যাচটা ছিল 'রায়পুর এ্যাথলেটিক ক্লাব-'এর সঙ্গেই।

রজত তার দলবল নিয়ে তিনটের আগেই ক্লাব ঘরে এসে হাজির হয়েছে। পাঁচটায় খেলা আরম্ভ হবে। সুতরাং দুই ঘণ্টা আগে ক্লাব ঘরে হাজির না হলে চলবে কেন?

বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময় প্রতিপক্ষ দল এসে হাজির হয়। তাদের ক্যাপ্টেন এসে রজতের সঙ্গে দেখা করতেই সে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে।

ঠিক পাঁচটায় খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। রজতই আজকের খেলার

রেফারী। মাঠের একদিকে গ্রামের লোকরা এসে জমায়েত হয়। তারা সবাই 'রায়পুর ক্লাব'-এর সমর্থক। প্রতিপক্ষের সমর্থকরাও এসেছে। তারা দাঁড়িয়েছে রায়পুর ক্লাবের সমর্থকদের বিপরীত দিকে।

গভীর উদ্দীপনার মধ্যে খেলার প্রথমার্ধ শেষ হয়। কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি। রজত ঘুরে ঘুরে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করছে।

এই সময়ে একটি বছর বার বয়সের ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে রজতের সামনে দাঁড়ায়। ছেলেটিকে দেখেই চিনতে পারে রজত। সে দেবেন দাসের ছেলে অজিত।

তাকে ঐ ভাবে আসতে দেখে রজত জিজ্ঞেস করে, "কিরে অজু! কি হয়েছে তোর ?"

অজিত কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, "বাবাকে এইমাত্র পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। আপনি এখুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলুন, রজতদা।"

—পুলিশে ধরে নিয়ে গেল! কেন বল্‌তো ?

—তা তো জানিনে রজতদা! বাবা উঠোনে বসে তামাক কাটছিলেন। এই সময় দারোগা আর চার পাঁচজন সিপাই এসে তাঁর হাতে হাতকড়া দিয়ে···

এই পর্যন্ত বলেই কেঁদে ফেলে অজিত।

প্রতিপক্ষদলের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে বাকি সময়টা খেলা পরিচালনা করতে অনুরোধ করে রজত অজিতের সঙ্গে মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় ক্লাবের একজন সভ্যকে ডেকে বলে যায়—"খেলা শেষ হবার আগে আমি যদি ফিরে না আসি, তাহলে তোমরা ক্লাব ঘরে অপেক্ষা করো।"

পথে চলতে চলতে রজত জিজ্ঞেস করে, "দারোগাবাবু কখন্ তোমাদের বাড়িতে এসেছিল ?"

—বেলা প্রায় সাড়ে তিনটের সময়। আমি তখন খেলা দেখতে আসবো মনে করে সবে বাড়ি থেকে বের হতে যাচ্ছি এমন সময় চার পাঁচজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু আমাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েন।

—তোমার বাবা তখন কি করছিলেন ?

—তিনি উঠোনে বসে তামাক কাটছিলেন ?

—তারপর ?

—তারপর বাবাকে দেখেই তিনি সিপাইদের বলেন—"বাঁধো, এই শালাকে।" সঙ্গে সঙ্গে সিপাইরা বাবাকে টেনে তুলে তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

—তোমার বাবা কিছু বললেন না ?

—বাবা বললেন, "আমি কি করেছি ? আমাকে আপনারা ধরছেন কেন ?" তার উত্তরে দারোগাবাবু ধমকে ওঠেন। তিনি বলেন, "কি করেছো, থানায় গেলেই টের পাবে।"

—তারপর ?

—তারপর ওরা আমাদের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র টান মেরে ফেলে দিতে থাকে। কিছুক্ষণ বাক্স-বিছানা ঘাঁটাঘাঁটি করে একজন সিপাই হঠাৎ বলে ওঠে—"পেয়েছি হুজুর।" এই বলে সে কাগজের মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে দারোগাবাবুর হাতে দেয়। তারপরেই বাবাকে ওরা টানতে টানতে নিয়ে যায়।

—পুলিসের সঙ্গে গ্রামের লোকেরা কেউ ছিল না ?

—ছিলেন রজতদা। দারোগাবাবু একখানা কাগজে তাদের সই নিয়ে গেছেন।

অজিতের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে ওঠে রজত। সে বুঝতে পারে যে, দেবেন দাসের বাড়িতে খানাতল্লাসী করেছে পুলিস এসে। কিন্তু কেন ? দেবেন দাসের মত নিরীহ আর নির্বিরোধী মানুষ এখন খুব কমই আছে। গরীব বলে সব সময়ই তিনি নম্র

ভাবে চলেন। কিন্তু কি এমন করে বসলেন ভদ্রলোক, যাতে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করলো তাঁকে!

ভেবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে রজত জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন অজিত?"

—বাবা, মা, দিদি আর আমি।

—আর কেউ নেই?

—না।

—আচ্ছা, এর আগে আর কোনোদিন দারোগাবাবু এসেছিলেন কি তোমাদের বাড়িতে?

—না।

রজত বুঝতে পারে অজিতকে প্রশ্ন করে কিছুই জানা যাবে না। সে তাই আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে চুপচাপ হাঁটতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অজিতদের বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়ায় ওরা। সদর দরজা মানে, কেরোসিনের কেনেস্তারা-কাটা টিন আর বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি এক জীর্ণ আবরণ। বাড়ির চারদিক ঘিরে পাট-কাঠির বেড়া, আর দুই দিকের বেড়াকে সংযুক্ত করে রেখেছে টিনের সেই দরজা। দীন গৃহস্থের আব্রু রক্ষায় দীনতম ব্যবস্থা।

দরজাটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ দেখে অজিত ডাকে, "মা, ও মা! দরজাটা খুলে দাও তাড়াতাড়ি।"

মায়ের পরিবর্তে দরজা খুলে দেয় বছর ষোল বয়সের একটি তরুণী। দরজা খুলতে খুলতে সে বলে, "এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে অজু? মা তোর জন্য ..."

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ রজতের দিকে দৃষ্টি পড়ে তার। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে যায় মেয়েটি।

রজতও দেখতে পায় মেয়েটিকে। দেখে মুগ্ধ হয় সে। মেয়েটি

অপূর্ব সুন্দরী। শুধু সুন্দরী বললেই সবটুকু বলা হয়না তার সম্বন্ধে। সে যেন অনুপম সৌন্দর্যে ঘেরা সচল বহ্নি-শিখা!

মেয়েটি পালিয়ে যেতেই রজত অজিতকে জিজ্ঞেস করে, "ইনিই বুঝি তোমার দিদি?"

অজিত বলে—হুঁ।

—আচ্ছা, আমি তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে জেনে এসো, তোমার বাবার গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কিনা।

—সে কি রজতদা, আপনি এখানে দাঁড়াবেন কেন? বাড়ির ভিতরে এসে নিজেই মার কাছ থেকে যা জানতে চান জেনে নিন।

রজত তখন অজিতের পিছনে পিছনে তাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। অজিতের মা গৌরীদেবী সামনেই ছিলেন। তাঁকে দেখেই অজিত বলে, "রজতদাকে ডেকে নিয়ে এলাম, মা।"

রজতকে এর আগে না দেখলেও তার নাম শুনেছিলেম গৌরীদেবী। তিনি তাই শশব্যস্তে ঘর থেকে একটা মাদুর বের করে দাওয়ার উপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন বাবু! আজ আমাদের বড় বিপদ।..."

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে রজত বলে, -"আমাকে বাবু বলে ডাকবেন না, মা। নিজের ছেলের মত আমাকে আপনি তুমি বলবেন।"

রজতের কথা শুনে গৌরীদেবী কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলেন, "তাই হবে, বাবা। তুমি এই মাদুরের ওপর বস।"

মাদুরে বসে রজত তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে বলুন তো?"

—বলবো বাবা, সব কথাই বলবো তোমাকে। আমার অজুর মুখে তোমার কথা আমি শুনেছি।

এই বলে অজিতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন - তুই যা তো অজু, এখান থেকে! তুই বরং তোর দিদির কাছে গিয়ে থাক ততক্ষণ।

অজিত চলে যেতেই তিনি বললেন, "কি বলবো বাবা, বলবার মত কথা এ নয়। এ সবই ছোটবাবুর কারসাজি।"

—ছোটবাবু! মানে, সতুদা?

—হ্যাঁ, বাবা।

—এখানেও সে নজর দিয়েছে! বেশ, আপনি আমার কাছে সব কথা খুলে বলুন। আপনার কোন চিন্তা নেই। সতুদা আমার খুড়তুতো ভাই বলেই যে আমি তার পক্ষ নেব এ রকম মনে করবার কোন কারণ নেই।

—তোমার কথা আমি শুনেছি বাবা। সত্যিই, আজকাল তোমার মত ছেলে দেখা যায় না।

—ও সব কথা এখন থাক। কি হয়েছে শুধু সেই কথাই বলুন আপনি।

—বলছি বাবা। ছোটবাবু অনেক দিন থেকে চেষ্টা করে আসছেন আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে। একে-তাকে দিয়ে অনেক রকম প্রলোভনও দেখিয়েছেন মেয়েকে! কিন্তু মেয়ে আমার তেমন নয়। ওসব কথা যারা বলতে আসতো কল্যাণী তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিত। আজ তিনদিন হ'ল, ছোটবাবু ওর কাছে পদীর মা নামে একটা নষ্ট মেয়েছেলেকে পাঠান। সে এসে প্রথমে অনেক রকম লোভ দেখায় কল্যাণীকে। কিন্তু ও কিছুতেই রাজী না হওয়ায় সে শাসিয়ে যায় যে, তার কথা না শুনবার ফল তিন চার দিনের মধ্যেই পাব আমরা।

পদীর মায়ের কথাগুলো মেয়ের মুখ থেকে শুনে প্রথমে ভেবে-ছিলাম যে, এবারও বুঝি আগের মত ফুসলাবার চেষ্টাতেই এসেছিল, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।

—আপনার কি তাহলে মনে হয় যে, সতুদাই দারোগাবাবুকে দিয়ে দেবেন বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন?

—হ্যাঁ বাবা, আমার তো সেইরকমই মনে হয়। এখন এই বিপদে কি যে কর্তব্য, কিছুই আমি বুঝতে পারছিনে। তাছাড়া, আমার

আবার ভয় হচ্ছে যে, আজ রাত্রেই হয়তো ছোটবাবুর লোকেরা কল্যাণীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। ঘরে আগুনও দিতে পারে তারা। এরূপ ঘটনা ঘটেছে এই গাঁয়েই।

এই পর্যন্ত বলতেই চোখে জল এসে যায় গৌরীদেবীর। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন, "এ বিপদে তুমি ছাড়া আমাদের দেখবার আর কেউ নেই বাবা, কল্যাণীকে তুমি রক্ষা কর ওদের হাত থেকে।"

—আচ্ছা, আমি দেখছি কতদূর কি করা যায়। অজিত কোথায় গেল! তাকে একবার ডাকুন তো।

রজতের কথায় গৌরীদেবী ছেলেকে ডাকেন, "অজু, ও অজু!"

অন্দরমহল থেকে অজিতের গলা শোনা যায়—যাই মা।

একটু পরেই সে এসে বলে—"আমাকে ডাকছিলে?"

—হ্যাঁ। তোর রজতদা কি বলছে শোন।

রজত বললে, "শোন অজিত! তুমি এখুনি একবার খেলার মাঠে যাও। ওখানে গিয়ে বিজয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলো যে, খেলার শেষে ওরা যেন সবাই এখানে চলে আসে। আমার নাম করে বলবে, কেমন?"

অজিত ঘাড় নেড়ে বললে, "আমি এখুনি যাচ্ছি।"

আজিত উঠানে নামতেই রজত বললে, "আর একটা কথা শুনে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে অজিত বলে, "কি বলুন।"

—ছেলেরা আসবার সময় যেন ক্লাব ঘর থেকে সবগুলো লাঠি নিয়ে আসে। বুঝলে?

—"হ্যাঁ, বুঝেছি", বলেই অজিত ছুট দেয় ওখান থেকে।

অজিত চলে গেলে গৌরীদেবীর দিকে তাকিয়ে রজত বলে, "আপনার কোন চিন্তা নেই মা, ছেলেরা আজ সারারাত আপনার বাড়ি পাহারা দেবে। আমিও থাকবো ওদের সঙ্গে। গুণ্ডার দল এলে তারা অক্ষতদেহে ফিরে যেতে না পারে এখান থেকে, সেই রকম ব্যবস্থা আমি করব।"

মারামারির কথায় গৌরীদেবীর বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে তিনি বলেন, "তোমার কোন বিপদ আপদ হবে না তো বাবা ?"

—বোধ হয় তেমন কিছু হবে না। আর যদি হয়ই তাতেও ভাববার কিছু নেই। আজ থেকে আপনাদের বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব আমার।

আধ ঘণ্টার ভিতরেই ছেলের দল এসে পড়ে। প্রত্যেকেই একখানা করে লাঠি হাতে নিয়ে এসেছে। বিজয় জিজ্ঞেস করে, "লাঠি নিয়ে আসতে বললেন কেন, রজতদা ?"

—আজ তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে। পারবে তো দরকার হলে লাঠি খেলার পরীক্ষা দিতে ?

—নিশ্চয়ই পারব, রজতদা।

—বেশ। তাহলে শোন, আজ রাত্রে তোমরা সবাই মিলে এই বাড়ি পাহারা দেবে। একসঙ্গে তিনজন করে জেগে পালা করে পাহারা দিতে হবে। যদি কোন গুণ্ডার দল আসে তারা যেন অক্ষতশরীরে ফিরে যেতে না পারে। তাদের সঙ্গে যদি জমিদার বাড়ির কোন লোক, মানে, আমার কাকা বা সত্যদাও থাকেন, তাতেও তোমরা ভয় পেয়ো না, বুঝলে ?

—"বুঝেছি রজতদা।" উত্তর দেয় আর একটি ছেলে।

রজত তখন বিজয়কে ডেকে তার হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়ে বলে, "এই টাকা দিয়ে তোমরা চাল-ডাল কিনে নিয়ে এসে অজিতের মাকে দিও। উনি খিচুড়ী রান্না করে দেবেন। আজ রাতটা খিচুড়ী খেয়েই থাকতে হবে তোমাদের।

বিজয় বললে—আমাদের বাড়িতে খবর দেওয়াটাও যে দরকার রজতদা।

—নিশ্চয়ই। তোমাদের মধ্যে দুজন আমার সঙ্গে চলো, আমি প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসছি।

—আপনি যাবেন রজতদা ?

—হ্যাঁ ভাই, আমিই যাব। আমার কথায় তোমরা এসেছ, সুতরাং আমাকেই যেতে হবে।

রজতের কথায় নিরাপদ আর সলিল এগিয়ে এসে বলে, "আমরা আপনার সঙ্গে যাব রজতদা!"

ওদের সঙ্গে করে সদর দরজা পর্যন্ত এসে আবার কি মনে করে ফিরে দাঁড়ায় রজত।

বিজয় বলে, "আর কিছু বলবেন রজতদা?"

—হ্যাঁ। তোমাদের বাড়িতে খবর দিয়ে আমি আবার আসছি। আমি এসে দেখতে চাই, তোমরা ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছো।

—আপনিও কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজ?

—হ্যাঁ, আমাকেও থাকতে হবে।

এই বলেই রজত বেরিয়ে যায় নিরাপদ আর সলীলকে সঙ্গে নিয়ে।

।। সাত ।।

এদিকে যখন এইসব রক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন চলছে, সেই সময় গ্রামের উত্তর দিকের জঙ্গলটার মধ্যে এক গোল সারিতে বসে সত্যরঞ্জন আর তার আজ্ঞাবহ গুণ্ডার দল। তারা আক্রমণের জন্য শুরু করেছে শলা-পরামর্শ।

এই পরামর্শসভায় দলপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছে সত্যরঞ্জন।

সত্যরঞ্জন বলে, "আজ রাত্রেই মেয়েটাকে নিয়ে আসা চাই, বুঝলে? বাড়িতে আজ পুরুষ লোক বলতে রয়েছে শুধু একটা পুঁচকে ছোঁড়া। সুতরাং বিনা বাধাতেই কাজ হাঁসিল করা যাবে বলে মনে হয়। রাত ঠিক বারটার সময় তোমরা এখান থেকে বের হবে। সবাই কালো মুখোশে মুখ ঢেকে যাবে। মশাল থাকবে সঙ্গে।

দেবেনের বাড়ির সামনে গিয়ে মশালগুলো জ্বেলে গোটা কয়েক পট্‌কা ফাটাবে আর "জয় মা কালী" বলে বার কয়েক ধ্বনি দেবে। এতে লোকে মনে করবে ডাকাত পড়েছে। ডাকাতের ভয়ে কেউ ওদিকে এগুবে না। তোমরা তখন বাড়ি ঢুকে দরজা ভেঙে মেয়েটাকে তুলে সোজা এখানে নিয়ে এসে কয়েদ রাখবে। বুঝতে পারলে ?

সত্যরঞ্জনের কথা শেষ হলে গুণ্ডাদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠলো, "সবই তো বুঝলাম, ছোটবাবু। কিন্তু এ কাজের জন্য বক্‌শিস্ কি পাব সে কথা তো বললেন না!"

—কি বকশিস্ চাও তোমরা? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে সত্যরঞ্জন।

—বেশি কিছু চাইনে ছোট বাবু। মাথা-পিছু দশটাকা করে নগদ আর আমাদের দশ জনের জন্য পাঁচ বোতল মদ পেলেই আমরা খুশি। এই ধরুন মোটমাট সত্তর টাকার মত।

—বেশ। তাই পাবে।

—টাকাটা অগ্রিম না পেলে যে চলছে না ছোটবাবু!

—তার মানে! তোমরা কি তাহলে অবিশ্বাস করছ আমাকে?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় ছোটবাবু। এ কাজের দস্তুরই এইরকম। ডাকাতি করে যদি মাল-কড়ি কিছু পাবার আশা থাকতো তাহলে আর অগ্রিম চাইতাম না। কিন্তু দেবেন দাসের বাড়িতে ডাকাতি করে যে মাল পাওয়া যাবে, সে তো শুধু আপনারই ভোগে লাগবে। তাই বলছিলাম যে, টাকাটা আমাদের আগামই দিতে হবে। কি বলহে তোমরা?

এই বলে ওখানে উপস্থিত অন্যান্য গুণ্ডাদের দিকে তাকায় সে।

সবাই তখন একবাক্যে বলে ওঠে, "পাঁচুদা ঠিকই বলেছে ছোটবাবু। টাকা আমাদের আগামই দিতে হবে।"

গুণ্ডাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যরঞ্জন বুঝতে পারে যে, ওদের দিয়ে কাজ করাতে হলে টাকাটা আগামই দিতে হবে। সে তাই

পকেট থেকে মণি ব্যাগ বের করে পাঁচখানা দশটাকার নোট পাঁচুর হাতে দিয়ে বলে, "এই নাও।"

নোট ক'খানা গুনে নিয়ে পাঁচু বলে, "এ তো আমাদের মজুরি। মালের দামটা দিন এবার।"

—সেটাও অগ্রিম দিতে হবে ?

—আজ্ঞে, তা হবে বই কি। এ সব কাজে ধার বাকি রাখা ঠিক নয়।

সত্যরঞ্জন তখন আর তুখানা দশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বলে, "বেশ, এই নাও তোমাদের মদ কিনবার টাকা ! কিন্তু পাঁচু, টাকা যেমন ঠিকমত পেলে, আমার কাজটা যেন ঠিকমতই হয়।

– সে কথা কি আর বলতে হয় ছোটবাবু। আপনার জিনিস কাল সকালে এই ঘরেই পাবেন।

পাঁচুর কথায় নিশ্চিন্ত হয় সত্যরঞ্জন। তার কামনা-কলুষিত মনের পর্দায় ফুটে ওঠে উদ্ভিন্নযৌবনা কল্যাণীর রূপ। কল্যাণীর দেহ-পুষ্পকে দলে পিষে মথিত করে তার সবটুকু মধু নিঃশেষে পান করবার পাশবিক কল্পনায় হিংস্র শ্বাপদের মত তার চোখ তুটি জ্বলে ওঠে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে রজতের কথা। রজত সেদিন অপমান করেছিল তাকে। দম্ভভরে বলেছিল, 'ভবিষ্যতে কোন মেয়ের পেছনে লাগলে এর চেয়েও বেশি শিক্ষা দেওয়া হবে তোমাকে।" নিজের মনেই সে বলে ওঠে, "শিক্ষা দেবে ! আমাকে শিক্ষা দেবে রজত। দেখি এবার সে কি করে আমার। সাধ্য থাকে তো কল্যাণীকে যেন রক্ষা করে সে।"

রাত প্রায় সাড়ে বারটার সময় হঠাৎ অনেকগুলো মশাল জ্বলে ওঠে দেবেন দাসের বাড়ির পাশে একটা ঝোপের আড়ালে। সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটা পটকা ফাটবার আওয়াজ আর "জয় মা কালী" বলে চিৎকার।

দেবেন দাসের বাড়ির বারান্দায় বসে ছিল ছেলের দল। রজতও

ছিল তাদের মধ্যে। মশালের আলো দেখে আর পটকা ফাটবার আওয়াজ ও 'জয় মা কালী' ধ্বনি শুনে সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। ছেলেরাও প্রস্তুত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

রজত অস্ফুট কণ্ঠে বলে, "হুঁসিয়ার ভাইসব। ওরা এসে গেছে।"

বিজয় বলে, "আমরাও তৈরি রজতদা।"

—শুধু তৈরি থাকলেই হবে না, বিজয়। আমাদের এখন কাজ করতে হবে পরিকল্পনা মত। তুমি, শিশির আর নিরাপদ বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থাক। রমেন, শঙ্কর, সলিল আর প্রদীপ বাইরে বাঁশবাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাক। হরেন অম্বিকা, শম্ভু আর কার্তিক থেকো বাইরের ঘরের পিছনে। প্রণব, বাদল, ভূপতি আর সতীশ আমার সঙ্গে থাক। আমরা দরজা আগলাচ্ছি। ওরা দরজার সামনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি হুইসেল দেব। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ওদের ঘিরে ফেলে মারতে আরম্ভ করবে।

বিজয় বলে, "যদি খুন টুন হয়ে যায় কেউ?"

—যায় যাবে। কোন ভয় নেই তোমাদের। ডাকাত দলের কেউ যদি খুনও হয় তাতে আমাদের কিছুই হবে না। যাহোক্, আর সময় নেই। তোমরা যে যার জায়গায় চলে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল যে-যার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেল। শুধু রজতের সঙ্গে যাদের থাকবার কথা, তারাই রইল ওখানে।

রজত বললে—এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না আমাদের। এসো, আমরা বেড়ার পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকি। আমরা যে এ বাড়িতে আছি তা আগে থেকে ওদের বুঝতে দিতে চাইনে।

এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই রজত তার পক্ষের ছেলেদের নিয়ে বেড়ার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। বলা বাহুল্য ছেলেদের প্রত্যেকের হাতেই পাঁচ ফুট সাইজের একখানা করে বাঁশের লাঠি।

মিনিট তিনেক পরেই হা-রে-রে-রে শব্দ করতে করতে ডাকাতের

দল ছুটে এলো দরজার সামনে। মশালের আলোয় রজত লক্ষ্য করলো যে, ডাকাতরা কালো কাপড়ের মুখোশ পরে এসেছে। তাদের হাতেও লাঠি।

ডাকাতদের মধ্যে একজন সজোরে লাথি মারলো সেই জীর্ণ টিনের দরজার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় দরজাটা।

ওরা তখন আর একবার পটকা ফাটিয়ে সদলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

রজতের মনে হ'ল, আর দেরি করা ঠিক নয়। সে তখন পকেট থেকে হুইসেল বের করে সজোরে তিনবার ফুঁ দেয়। তারপর সঙ্গের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আক্রমণের ইঙ্গিত দেয়।

ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গেই লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের দল। আরম্ভ হয়ে গেল ডাকাত দলের সঙ্গে ছেলের দলের লড়াই।

রজতের লাঠির অব্যর্থ আঘাতে একজন ডাকাত 'বাপ্‌রে' বলে মাটিতে পড়ে যায়। ছেলেদের মধ্যেও একজন আহত হয় ডাকাতদের লাঠির আঘাতে।

এদিকে রমেন, হরেন আর প্রণবের দল এসে ডাকাতের দলকে তখন একেবারে ঘিরে ফেলে। রমেনের দল বাইরে থেকে এসে পড়ায় ডাকাতদের পালাবার পথও তখন বন্ধ হয়ে যায়।

এইভাবে আক্রান্ত হবে ডাকাতরা একথা ভাবতেও পারেনি। বিপদ দেখে পাঁচু সর্দার বলে ওঠে—কে কোথায় শীগ্‌গির পালা!

কিন্তু কোথায় পালাবে? পালাবার সব পথ তখন বন্ধ।

রজত হুঙ্কার দিয়ে উঠে—কোথায় পালাবে বদমাসের দল? আজ এখানে তোদের প্রত্যেকের মাথা দিয়ে যেতে হবে!

এই বলে ছেলেদের উদ্দেশ করে বলে উঠল—এদের একজনও যেন পালিয়ে না যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখো তোমরা।

ডাকাতের দল তখন মরিয়া হয়ে লাঠি চালাতে আরম্ভ করে ছেলেদের ওপর। তাদের সর্দার এগিয়ে এলো রজতের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। সর্দারের একটা আঘাত প্রতিরোধ করে রজত ক্ষিপ্রহস্তে লাঠি ঘুরিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় সর্দার।

সর্দারের অবস্থা দেখে ডাকাতের দল তখন পালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। বৃষ্টির মত লাঠির আঘাত পড়ছে তখন তাদের গায়ে আর মাথায়। ওরা তখন পালাবার জন্য পাগল হয়ে উঠে। কোন রকমে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতে ওরা তখন দরজার দিকে হঠতে থাকে।

ডাকাতের দল পালাবার চেষ্টা করছে দেখে রমেনের দলের উদ্দেশে রজত চিৎকার করে উঠে—ওদের পথ আগলাও রমেন। কেউ যেন যেতে না পারে।

এর পর যা আরম্ভ হল সে এক ভীষণ ব্যাপার! পালাবার পথ বন্ধ দেখে ডাকাতের দল মরণ-পণে লাঠি চালাতে আরম্ভ করে! ছেলের দলও আরম্ভ করে প্রতি-আক্রমণ।

হঠাৎ রমেনের মাথায় একটা আঘাত লেগে সে মাটিতে পড়ে যায়। রমেনকে পড়ে যেতে দেখে বাইরের ছেলেরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এ সুযোগ নষ্ট হতে দিল না ডাকাতরা। বাঘের ভয়ে ভীত হরিণের মত তারা তখন প্রাণপণে ছুট দিল জঙ্গলের দিকে।

ডাকাতের দল পালিয়ে যায় দেখে বাঘের মত লাফ দিয়ে রজত তাদের পিছনে পিছনে ছুটলো। ছেলের দলও ছুটলো তাদের সঙ্গে।

ছেলের দলের আক্রমণে তিনজন ডাকাত ধরাশায়ী হ'ল। বাকি ছয় জন তখন পালিয়ে গেছে।

এদিকে বিজয়ের দল তখন ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকাতের সর্দারটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। বাঁধবার সময় তার মুখোশ খুলে যায়, টর্চের আলোয় ছেলেরা চিনতে পারে তাকে। লোকটা পাশের গ্রামের পাঁচু বাগ্‌দী।

তাকে চিনতে পেরে বিজয় বলে—"কি হে পাঁচু। মেয়ে চুরি

করতে এসে নিজেই ধরা পড়ে গেলে শেষ পর্যন্ত !" পাঁচুর তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

বিজয় বলে - এদিক ওদিক তাকিয়ে কি দেখছো ? ছোটবাবুকে খুঁজছো বুঝি ? বলো তো তাঁকে খবরটা পাঠিয়ে দিই।

এইসময় রজত আর তার সঙ্গের ছেলেরা এসে হাজির হয়। বাইরে যারা আহত হয়েছিল সেই তিনজন ডাকাতকেও বেঁধে এনেছে তারা।

হাত-পা বাঁধা ডাকাতগুলোকে উঠানের মধ্যে নামিয়ে রেখে তাদের ঘিরে বসে ছেলের দল। শিকারীরা কোন হিংস্র জানোয়ার শিকার করলে সেই জানোয়ারের চারদিকে যেমন সবাই মিলে ঘিরে বসে ডাকাতদের চারপাশেও ঠিক তেমনিভাবে বসে ওরা।

রজতের তখন মনে পড়ে যায় রমেনের কথা। রমেন যে আহত সেকথা তার মনেই ছিল না এতক্ষণ।

সে তখন লজ্জিত হয়ে বলে ওঠে—রমেন কোথায় ভাই ?

ছেলেদের ভিতরে রমেনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। "এই যে রজতদা আমি এখানে।

—তোমার আঘাতের অবস্থা কেমন ভাই ? মাথা ফাটেনি তো ?

—না রজতদা, মাথা ওরা ফাটাতে পারেনি। তবে মাথা না ফাটলেও চোটটা বেশ জোরেই লেগেছিল। ফুলে আছে।

রমেনের কথায় মৃদু হেসে রজত বলে—ডাকাত ঠেঙাতে গেলে ওরকম একটু-আধটু চোট্ লাগবেই।

এই বলে পাঁচু বাগদীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে—কি হে সর্দার মশাই ? এবার যদি তোমাদের জ্যান্ত অবস্থায় মাটিতে পুতে ফেলি তাহলে কেমন মজাটা হয় বলো তো ?

রজতের কথা শুনে পাঁচু বাগদীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়। তার মনে হয়, সত্যিই বুঝি তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে। সে তাই হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে—আমাকে মাপ করুন

হুজুর। আমি আপনার কাছে নাকে খত দিচ্ছি, এ রকম কাজ আর জীবনে করব না।

পাঁচুর এই কথায় রজত হেসে উঠে বলে—থাক, তোমাকে আর নাকে খত দিতে হবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। শুধু তোমাকেই নয়, তোমার দলের ঐ তিনজনকেও ছেড়ে দিচ্ছি আমি।

পাঁচু আশ্চর্য হয়ে যায় রজতের কথা শুনে। ডাকাতি করে যারা ধরা পড়ে তাদের যে কি হাল হয় সে কথা পাঁচু খুব ভাল করেই জানে ; আর জানে বলেই ছাড়া পাবার কথা শুনে সে আশ্চর্য হয়।

সে তাই বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে—আমাদের আপনি ছেড়ে দেবেন হুজুর!

—হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। তবে ছাড়া পাবার আগে তোমাদের প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, এরপর আর এই ধরণের অসৎ কাজ তোমরা করবে না। মনে রেখো, তোমাদেরও মা বোন আছে। তাদের কথা মনে করে আজ আমার কাছে কথা দিয়ে যেতে হবে যে, এরপর সব মেয়েকেই তোমরা নিজেদের মা বোন মনে করবে।

—আপনি আমার মাথায় জুতো মারুন হুজুর। আমি যে কাজ করতে এসেছিলাম তার জন্য জুতোই আমার পাওনা।

রজত তখন নিজ হাতে পাঁচু আর তার সঙ্গীদের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে—এই আমার বিচার, পাঁচু! মুক্তি দিয়েই আমি তোমাদের শাস্তি দিলাম। ইচ্ছা হলে আবার তোমরা দলে ভারী হয়ে আসতে পার। আমরা তার জন্য প্রস্তুত। তবে আশা করি, সে রকম দুর্মতি আর তোমাদের হবে না।

ছাড়া পেয়ে পাঁচু বাগদী রজতের পায়ের ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বলে—আপনি আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, হুজুর। শত্রুকে যিনি এভাবে ক্ষমা করেন তিনি দেবতা। সেই দেবতার পায়েই আমি আজ আশ্রয় নিলাম।

রজত তখন তার হাত ধরে টেনে তুলে বলে—ওঠো পাঁচু, বাড়ি

যাও। তোমার বুকে সাহস আছে, হাতে শক্তি আছে, এই সাহস আর শক্তি নিয়ে তুমি এরপর মানুষের যাতে ভাল হয় সেই কাজ করতে চেষ্টা করো।

পাঁচু তখন তার দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে—ওরে, তোরা চুপ করে দেখছিস কি? শীগ্‌গির এসে দেবতার পায়ের ধুলো নে।

পাঁচুর কথায় বাকি তিনজন ডাকাতও এসে রজতের পায়ের ওপর মাথা রাখে। রজত তাদের একে একে হাত ধরে তুলে বলে—তোমরা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে যাও ভাইসব।

এই সময়ে পাঁচু বলে—আপনি একবার এ বাড়ির মা আর দিদি-ঠাকরুনকে ডেকে দিন হুজুর। আমি তাঁদের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যেতে চাই।

পাঁচুর কথায় রজত অজিতকে ডেকে বলে—তোমার মা আব দিদিকে একবার ডেকে দাও তো, অজু ভাই। বলো যে, আমি তাঁদের ডাকছি।

অজিতের আর ডাকতে হয় না। কল্যাণীর হাত ধরে গৌরীদেবী এসে দাঁড়ান রজতের পাশে।

তাঁরা আসতেই পাঁচু ছুটে এসে তাঁদের পায়ের কাছে গড় করে বলে—মাঠান, দিদিঠান, আপনাদের কাছে আজ আমি এই পিরতিজ্ঞে করে যাচ্ছি যে, আজ থেকে পাঁচু বাগদী আপনাদের ছেলে আর ভাই। শুধু আপনাদেরই বা বলি কেন, আজ থেকে পাঁচু বাগদীর কাছে দুনিয়ার সব মেয়েই হবে মা আর বোন।

পাঁচুর এই পরিবর্তন দেখে গৌরীদেবীর চোখে জল এসে যায়। পাঁচুর মাথায় হাত দিয়ে তিনি বলেন—আশীর্বাদ করি, তুমি মানুষের মত মানুষ হও।

গৌরীদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে পাঁচু উঠে দাঁড়ায়। তারপর রজতের কাছে গিয়ে বলে—আমরা তাহলে যাই দেবতা?

—হ্যাঁ যাও।

পাঁচু তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই আবার কি মনে করে ফিরে আসে।

রজত জিজ্ঞেস করে—আবার ফিরলে যে, পাঁচু?

—একটা কথা বলে যাওয়া দরকার মনে করলাম দেবতা!

—কি কথা বল!

—দিদিঠানকে কিছুদিনের জন্য এখান থেকে সরিয়ে রাখুন, দেবতা।

—কেন বলো তো?

—আপনি তো আর সব সময় দিদিঠানকে আগলে রাখতে পারবেন না। আর, দেশে পাঁচু বাগদীর মত ডাকাত আরও থাকতে পারে।

—তোমার কথা আমার মনে থাকবে ভাই।

পাঁচু তখন আর একবার রজতকে প্রণাম করে ওখান থেকে চলে যায়।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

॥ আট ॥

পরদিন সকাল প্রায় ন'টার সময় রজত থানায় গিয়ে অফিসার-ইন্-চার্জ-এর সঙ্গে দেখা করে।

অফিসার-ইন্-চার্জ রজতকে চিনতেন না। তিনি তাই রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—কি চাই আপনার?

—দেবেন দাসের খবর নিতে এসেছি আমি।

—অফিসে দেবেন দাস বলে কেউ নেই, মশাই। আপনি গারদে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা আসুন, আমি এখন ব্যস্ত।

—কোন চাকুরের খোঁজ করতে আমি আসিনি।

—তবে?

— আমি যে দেবেন দাসের কথা জানতে চাইছি, তাঁকে আপনারা গতকাল গ্রেপ্তার করে এনেছেন।

— ও, তাই বলুন। তা, কি জানতে চান আপনি ?

— কি অপরাধে ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই কথাটা জানতে এসেছি আমি।

— আপনি কে মশাই, লাটসাহেবের নাতি নাকি যে, জানতে চাইলেই আমাকে তা জানাতে হবে ?

— লাট সাহেবের নাতি আমি নই। আমি যার নাতি সে ভদ্র-লোকের নাম ছিল মহেন্দ্র চৌধুরী। রায়পুরের জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরী।

— কি বললেন ! আপনি মহেন্দ্র চৌধুরীর নাতি, অর্থাৎ আপনারই নাম রজত চৌধুরী ?

— বাবা আমার ঐ নামই রেখেছেন বটে।

— আরে মশাই, আপনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি। বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হই।

— আপনাকে ধন্য করবার মত ব্যক্তি আমি কি করে হলাম বুঝতে পারছি না তো ?

— পারছেন বই কি, মনে মনে সবই বুঝতে পারছেন।

— কি রকম ?

— রকমটা কি বলে দিতে হবে ? জমিদারের ছেলে হয়ে যাঁরা ইনকেলাব করেন, আমার তো ধারণা তাঁরা পুলিশের চাইতেও ঘুঘু। তা ভাই বড় বড় শহর থাকতে এই গরিব বেচারীদের এলাকায় ওসব কেন ?

দারোগাবাবুর কথা শুনে রজত গম্ভীর স্বরে বলে — ও সব কথা এখন থাক দারোগাবাবু, আমি যা জানতে এসেছি দয়া করে সেই খবরটাই দিন।

— কি জানতে চাইছেন যেন ? ও, মনে পড়ছে বটে ! তা মশাই, ও সব চোর-জোচ্চোরদের খবরে আপনার আবার কেন দরকার পড়লো ?

—চোর-জোচ্চোর—তার মানে ?

—মানে, দেবেন দাস একজন পাকা চোর না, ঠিক চোরও বলা চলে না তাকে। সে হ'ল চোরের থলেত্‌দার। চার শ' এগার ধারার আসামী।

—বলেন কি ! ওঁর মত নিরীহ গরিব ভদ্রলোক চার শ' এগার ধারার আসামী !

—আর বলি কি ! পুলিশের চাকরি করে ও রকম কত নিরীহ ভদ্রলোককে চুরি-ডাকাতি করতে দেখছি। দেবেন দাস তো দেবেন দাস, কত হরিদাস, রামদাস, শ্যামদাস আজকাল এই পেশা ধরেছে জানেন ?

—আমার তা জানবার দরকার করে না। আমি এসেছি দেবেন দাসের জামীন হতে।

—চুরি কেসের আসামীর জামীন হতে এসেছেন আপনি ! তাজ্জব ব্যাপার তো ?

—হ্যাঁ, কতকটা তাজ্জব ব্যাপারই বটে ! যাহোক, আপনি ওঁকে জামীনে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন কি ?

—না মশাই, 'নন বেলেবল্‌ সেক্সন'-এর আসামীকে আমি জামীন দিতে পারি না। আপনি ইচ্ছা করলে কোর্টে জামীনের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। আজই ওকে কোর্টে হাজির করা হবে।

—আপনি যখন জামীন দিবেন না তখন বাধ্য হয়ে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে আমাকে। আচ্ছা ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যেতে পারে কি ?

রজতের এই কথায় দারোগাবাবু তাকে কিছু না বলে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন—দরওয়াজা !

একটু পরেই একজন সিপাই এসে খট্‌ করে বুটের আওয়াজ করে বলে—হজৌর !

দারোগাবাবু বলেন—তুমি এই বাবুকো ফাটককা সামনে লে যাও। আসামী দেবেন দাস কা সাত ইন্‌কো মোলাকাত্‌ করা দেও।

সিপাই তখন রজতের দিকে তাকিয়ে বলে – চলিয়ে বাবু !

একটু পরেই ফাটকের সামনে এসে হাজির হয় রজত। ফাটকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিপাই বলে – আসামী দেবেন দাস হিঁয়া আও !

দেবেন দাস দরজার ওধারে এসে দাঁড়াতেই রজত বললো – আপনারই নাম দেবেনবাবু ? আমার নাম রজত চৌধুরী। আমি আপনার জামীনের চেষ্টা করছি।

রজতের কথায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে দেবেন দাস, বলেন – আমাকে এই নরক থেকে বের করে নিন, বাবু। এরা আমাকে শুধু শুধু ধরে এনে আটকে রেখেছে।

– কিন্তু দারোগাবাবু তো বললেন, আপনি চোরের থলেতদার।

– সব মিথ্যে কথা, বাবু। চোরাইমাল আমি চোখেও দেখিনি কোনদিন। তাছাড়া চোরাই মাল রাখবার মত টাকাই বা আমার কোথা ?

– আচ্ছা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কোর্ট থেকে আপনার জামীনের ব্যবস্থা করছি।

– তাই করুন বাবু। আমি আটকা থাকলে ওদিকে বোধ হয় সর্বনাশ হয়ে যাবে।

– আপনার কোন ভয় নেই, দেবেন বাবু। আমি সব কথাই শুনেছি। আপনার মেয়েকে রক্ষা করবার ভার আমি নিজে নিয়েছি।

– আপনি আমাকে বাঁচান বাবু। মেয়ের কথা চিন্তা করে আমি পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছি।

– আমি তা জানি, আর জানি বলেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন যাই। এখুনি আমাকে উকিল বাড়িতে যেতে হবে।

– আচ্ছা, আসুন বাবু, নমস্কার।

—আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেই আমি খুশি হব, দেবেন বাবু। বাপের বয়সী লোকের মুখ থেকে 'বাবু' ডাক শুনলে আমি লজ্জা পাই।

—সে কি বাবু! আপনি যে আমাদের মনিব। মনিবকে কি নাম ধরে ডাকা যায়?

—নিশ্চয়ই যায় দেবেন বাবু। তাছাড়া জমিদার হলেই মনিব হয় না। আপনি খাজনা দিয়ে জমি ভোগ করছেন; সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? যাই হোক, ও সব বিষয় পরে একদিন ভাল করে বুঝিয়ে বলবো আপনাকে; আজ আর সময় নেই। আচ্ছা, নমস্কার।

থানা থেকে বের হয়ে রজত সোজা মহকুমায় গিয়ে ফৌজদারী কোর্টের সবচেয়ে নামকরা উকিল শশাঙ্ক সেনের সঙ্গে দেখা করে।

রজতের পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে খুবই খাতির যত্ন করেন এবং পরদিন এস. ডি. ও-র কোর্টে দেবেন দাসের জামীনের জন্য দরখাস্ত করবেন বলেন। রজতকেও তিনি কোর্টে হাজির থাকতে বলেন।

পরদিন কোর্ট খুলতেই জামীনের দরখাস্ত পেশ করেন শশাঙ্ক বাবু। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে ঘোর বিরোধিতার ফলে এস. ডি. ও. সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন না।

আসামী দেবেন দাসকে তিনি জেল হাজতে পাঠাবার হুকুম দেন।

রজতের তখন জেদ বেড়ে যায়। পরদিনই সে কাগজপত্র নিয়ে রওনা হয় জেলার সদরে। উদ্দেশ্য, জজকোর্ট থেকে দেবেনবাবুর জামীন মঞ্জুর করিয়ে আনবে।

জজকোর্টে হাজির হয়ে একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে যায় রজত। সে যখন জজকোর্টের সেরা উকিলের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ তার সতীর্থ নিহারেন্দু সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিহারেন্দুই প্রথমে তাকে লক্ষ্য করে। রজত তখন একজন টাইপিস্টের সামনে

দাঁড়িয়ে জজকোর্টের সব চেয়ে নামকরা ফৌজদারী উকিলের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছিলো। হঠাৎ পেছন থেকে কে তার কাঁধে হাত দিয়ে নাম ধরে ডাকে।

রজত আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাতেই দেখে, নিহারেন্দু দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পিছনে।

নিহারেন্দু বলে – কি রে! এখানে কি করছিস তুই?

রজত বলে – আমি এখানকার সেরা উকিলের সন্ধান করছি, ভাই। কিন্তু তুই এখানে কি মনে করে?

—বিশেষ কিছু মনে করে নয়। আমি এসেছিলাম বাবার কাছে একটা খবর দিতে।

– তোর বাবা কি করেন এখানে? উকিল নাকি?

– উকিল হবেন কেন, বাবা এখানকার জজ।

– তোর বাবা এখানকার জজ্! মাই গুড গড, তাহলে তো আমায় আর কোনই ভাবনা নেই।

– ভাবনা নেই মানে? তুই কি কোন মামলায় পড়েছিস নাকি?

– না ভাই, মামলায় পড়বার মত সুযোগ এখনও পাইনি। আমি এসেছি একটা লোকের জামীন করাতে। নিম্ন আদালত লোকটাকে জামীন দেয়নি।

– দরখাস্ত কি ফাইল করা হয়ে গেছে?

– না।

– তুই উঠেছিস কোথায়?

– একটা হোটেলে।

– হোটেলে থেকে আর দরকার নেই। চল, আমাদের বাংলোয় থাকবি।

– কিন্তু দরখাস্তটা…

– সে পরে হবে। বাবার সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলে তারপর দরখাস্ত ফাইল করিস।

—তোর বাবা যদি কিছু মনে করেন তাতে ?

—তার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। বাবাকে যা বলবার আমিই বলবো।

এই বলেই নিহারেন্দু রজতকে সঙ্গে করে তার বাবার গাড়ির কাছে গিয়ে সোফারকে বলে, আমাদের দুজনকে বাড়ি পেঁাছে দাও তো ভাই।

সোফার সসম্মানে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলে—উঠুন হুজুর।

নিহারেন্দু হেসে ওঠে সোফারের কথায়। সে বলে, আমরাও শেষ পর্যন্ত হুজুর হয়ে গেলাম দেখছি।

ওরা উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি চালিয়ে দেয় ড্রাইভার। এবং আধঘণ্টার মধ্যেই রজত জজ সাহেবের বাংলোয় স্থান লাভ করে।

বাড়িতে এসে নিহারেন্দু দেবেন দাসের মামলা সম্বন্ধে সব কথা খুঁটিয়ে খুটিয়ে জেনে নেয় রজতের কাছ থেকে। রজতও কোন কথা গোপন না করে সব কিছু খুলে বলে বন্ধুকে। সব শুনে নিহারেন্দু বলে—এ যে দেখছি রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু যাকে নিয়ে এই এ্যাড্ভেঞ্চার সে কি বলে ?

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ তোর এই রোমাঞ্চকর নাটকের নায়িকা কল্যাণী কি বলে ? আমার তো মনে হয়, কল্যাণী তার রক্ষাকর্তার গলায় মালা দেবার জন্য 'রেডি' হয়ে বসে আছে।

—যাঃ !

—যা নয়, হ্যাঁ। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে কুমারী কল্যাণী দাসের সঙ্গে শ্রীমান্ রজত চৌধুরীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হতে চলেছে।

—কল্যাণীর দায় পড়েছে আমাকে বিয়ে করবার !

—বলিস কি রে ? তোর মত ছেলে পেলে কল্যাণী তো কল্যাণী,

তার বাপ সুদ্ধ বর্তে যাবে যে! আচ্ছা ভাই, তোর নায়িকার চেহারা কেমন বল্ তো?

—অনিন্দনীয়।

—'হিয়ার ইউ আর মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।' যাই হোক্, আজ রাত্রেই বাবার কাছে সব কথা বলে তোর ভাবী শ্বশুরের জামীনের ব্যবস্থা করছি। তুই এখন নিশ্চিন্ত মনে "পিয়া-মুখ-চন্দার" ধ্যান করতে পারিস।

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে নিহারেন্দু তার বাবার সঙ্গে রজতের পরিচয় করে দেয়। বাবাকে সে বলে, কলেজে রজতই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

ছেলের প্রিয় বন্ধুকে দেখে জজ সাহেব খুবই খুশি হন।

এরপর কথায় কথায় রজতের দরখাস্তের বিষয় উত্থাপন করে নিহারেন্দু।

জজসাহেব হাসি মুখে বলেন—তুমি কি বন্ধুর পক্ষে 'ব্রীফ' নিয়েছ নাকি? যার দরখাস্ত, সে যখন নিজেই হাজির রয়েছে তখন আর উকিলের দরকার কি?

জজসাহেবের কথায় বাধা দিয়ে তাঁর স্ত্রী নন্দিতা দেবী বলে ওঠেন—এটা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না। আসামী ফরিয়াদীর কথা তো তোমরা উকিলের মুখ থেকেই শোনো।

জজসাহেব হেসে বলেন—সব সময় নয়। তাছাড়া রজত নিজেই এসেছে আর একজনের হয়ে ওকালতি করতে। তাই তো বলছি যে, ব্যাপারটা রজতের মুখ থেকে শুনলেই ভাল হবে।

জজসাহেবের স্নেহপূর্ণ কথায় রজতের মনের আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। সে তখন যথাসম্ভব অল্প কথায় মামলার বিবরণ এবং তার উৎপত্তির কারণ বর্ণনা করে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলে।

সব শুনে জজসাহেব বলেন—ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে দেখছি।

৪১১ ধারার আসামী, তার ওপর আবার বাড়িতে চোরাই মাল পাওয়া গেছে ; এ আসামীকে জামীন দেওয়া কঠিন।

জজ সাহেবের কথা শুনে নন্দিতা দেবী বলেন—ওসব কথা আমি শুনতে চাইনে, জামীন তোমাকে দিতেই হবে।

জজ সাহেব হেসে বলেন—জোর নাকি ?

—হ্যাঁ জোরই।

—বেশ, তাহলে তাই হবে। জামীন না দিয়ে যখন রক্ষা নেই, তখন আর কি করা যাবে।

এই বলে রজতের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলেন—কাল কোর্ট খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি দরখাস্ত পেশ করো। যদি সম্ভব হয়, কোর্টের সেরা উকিল কিরণ ব্যানার্জীকে দিয়ে দরখাস্তটা 'মুভ' করো, বুঝলে ?

পরদিন যথাসময়ে দেবেন দাসের জামীনের দরখাস্ত জজ সাহেবের কাছে পেশ হয়। খ্যাতনামা উকিল কিরণ ব্যানার্জী মুভ করেন সে দরখাস্ত। কিরণ বাবুর বক্তৃতা শুনে জজ সাহেব সেইদিনই দরখাস্তের নিষ্পত্তি করেন। পাঁচশ' টাকার জামীনে দেবেন দাসের মুক্তির আদেশ দেন তিনি।

জজ সাহেবের হুকুমনামা নিয়ে পরদিনই রজত রওনা হয়। অবশ্য চলে আসবার আগে কিরণ বাবুকে সে দেবেন দাসের পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করে যেতে ভুল করে না।

বাড়িতে ফিরে আসবার পরদিনই দেবেন দাসকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসে রজত।

॥ নয় ॥

নির্দিষ্ট দিনে মহকুমা আদালতে দেবেন দাসের মামলা আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষ থেকে 'কোর্ট সাব ইনস্‌পেক্টার' উঠে দাঁড়ান মামলার উদ্বোধন করতে। তিনি যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন তার সারমর্ম এইরকম :–

"বিগত তেইশে জুন রাত্রে রায়পুর থানার জমাদার রামবিশাল পাঁড়ে দু'জন সিপাই সঙ্গে নিয়ে রাউণ্ডে বের হয়। রাউণ্ড দিতে দিতে তারা গঙ্গারামপুর গ্রামের ৫৬৫ ধারার দাগী আসামী পিয়ার মহম্মদের বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করে। কিন্তু পিয়ার মহম্মদকে বাড়িতে পায় না ওরা।"

এর পরদিনই লক্ষ্মীপুর গ্রামের পঞ্চানন দত্ত থানায় এসে চুরির এজাহার দেয়। সে বলে যে, গত রাত্রে তার বাড়িতে চুরি হয়েছে। কি কি জিনিস চুরি হয়েছে তার একটা তালিকাও সে দেয়। এই এজাহার পেয়ে রায়পুর থানার ও. সি. সতীশ ঘোষ সেইদিনই পঞ্চাননের বাড়িতে যান তদন্ত করতে। অকুস্থলে গিয়ে তিনি দেখতে পান পঞ্চাননের ঘরে সিঁধ কাটা রয়েছে। তদন্তের সময় একটা ভাঙা বাক্স বের করে সতীশবাবুকে দেখিয়ে পঞ্চানন বলে যে, বাক্সটাকে সে ঘণ্টাখানেক আগে একটা জঙ্গলের মধ্যে পেয়েছে। পঞ্চানন আরও বলে যে, ঐ বাক্সের মধ্যে একজোড়া দুল, আর একছড়া সোনার হার ছিল। চোর শুধু ঐ জিনিসগুলোই নিয়ে গেছে। বাকি কাপড়জামা সবই ঠিক আছে।

সতীশবাবু তখন জিজ্ঞেস করেন চুরি সম্পর্কে কাউকে সে সন্দেহ করে কিনা? এর উত্তরে পঞ্চানন জানায় পিয়ার মহম্মদকে সন্দেহ করে সে।

ও. সি. তখন আর কালবিলম্ব না করে সেইদিনই পিয়ার মহম্মদের বাড়ি খানাতল্লাসী করেন। তল্লাসীতে তার ঘর থেকে চোরাই

তুল জোড়া পাওয়া যায়। এরপর তিনি পিয়ার মহম্মদকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এসে বাকি মাল, অর্থাৎ হারগাছা কোথায় রেখেছে জানতে চান।

পিয়ার মহম্মদ প্রথমে কোন কথাই স্বীকার করতে চাইলে না, শেষ পর্যন্ত সব কথা খুলে বলে। সে বলে যে, হারগাছা সে রায়পুর গ্রামের দেবেন দাসের কাছে ষাট টাকায় বিক্রি করেছে। সে আরও বলে এর আগেও কয়েকবার দেবেন দাস তার কাছ থেকে চোরাই মাল কিনেছে।

পিয়ার মহম্মদের কাছে এই খবর পেয়ে সতীশবাবু সেই দিনই দেবেন দাসের বাড়ি খানাতল্লাসী করেন। তল্লাসীর সময় তার ঘর থেকে চোরাই মাল অর্থাৎ হারগাছা বেরিয়ে পড়ে। এর পরেই দেবেন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট সাব ইনস্‌পেক্টর আরও বলেন আসামী দেবেন দাসের বাড়িতে যখন খানাতল্লাসী করা হয়, সে সময় গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই দেখেছেন দেবেন দাসের ঘর থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন—আসামী পিয়ার মহম্মদ আর দেবেন দাস দুজনেই সমান দোষী। আমি তাই আদালতের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, আসামী পিয়ার মহম্মদকে, দণ্ডবিধির ৩৮০।৭৫ ধারা মতে এবং আসামী দেবেন দাসকে দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা মতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

কোর্টবাবুর বক্তৃতা শেষ হতেই ডাক পড়ে সরকার পক্ষের ১নং সাক্ষী পঞ্চানন দত্তর। নিয়মিত সত্য পাঠের পর কোর্টবাবু তাকে জিজ্ঞেস করেন—আপনার নাম ?

—আজ্ঞে শ্রী পঞ্চানন দত্ত।

—আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছিল ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—থানায় এজাহার দিয়েছিলেন ?

– দিয়েছিলাম হুজুর।

– কাউকে সন্দেহ হয় বলেছিলেন ?

– হ্যাঁ, পিয়ার মহম্মদকে সন্দেহ হয় বলেছিলাম।

– আচ্ছা দেখুন তো, হুজুরের সামনের ঐ সোনার জিনিসগুলো আপনার কি না ?

পঞ্চানন জিনিসগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলে—হ্যাঁ হুজুর। ও সবই আমার।

কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর তখন একগাছা সোনার হার হাকিমের টেবিল থেকে হাতে তুলে বলেন – দেখুন তো এই নেকলেশ ছড়া চিনতে পারেন কি না ?

—আজ্ঞে, ওটা আমার স্ত্রীর নেকলেস।

হারগাছা নামিয়ে রেখে তিনি তখন এক্‌জোড়া দুল তুলে বলেন – আর এই দুল জোড়া ?

– দুল জোড়া আমার পুত্রবধূর, হুজুর।

কোর্ট ইনস্‌পেক্টর তখন সাফল্যের হাসি হেসে পঞ্চানন দত্তর দিকে তাকিয়ে বলেন – আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।

পঞ্চানন কাঠগড়া থেকে নামবার চেষ্টা করতেই আসামী পক্ষের উকিল কিরণ ব্যানার্জী উঠে দাঁড়ান। পঞ্চানন দত্তর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বলেন – দাঁড়ান।

পরে হাকিমের দিকে তাকিয়ে বলেন—হুজুরের অনুমতি নিয়ে সাক্ষীকে আমি জেরা করতে চাই।

হাকিম বলেন—বেশ, করুন।

কিরণ বাবু তখন হাকিমের দিকে তাকিয়ে বলেন – বাদী পক্ষের লোকদের এবং বিশেষ করে সত্যরঞ্জন চৌধুরীকে বাইরে যেতে বলুন, ইয়োর অনার।

হাকিম কোর্ট ইনস্‌পেক্টরের দিকে তাকান।

কোর্ট ইনস্‌পেক্টরের নির্দেশে বাদী পক্ষের যে সব সাক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী ওখানে উপস্থিত ছিল, তারা সবই বাইরে চলে যেতে বাধ্য হ'ল।

বলাবাহুল্য, সত্যরঞ্জনকেও বাইরে যেতে হ'ল।

এর পর কিরণ বাবু তাঁর জেরা শুরু করেন। পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন যে রাত্রে চুরি হয় আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

—বাড়িতেই ছিলাম।

—আপনার বাড়িতে ক'খানা শোবার ঘর ?

—দুখানা।

—কোন্ কোন্ ভিটায় ?

—একখানা পূবের ভিটায় আর একখানা উত্তরের ভিটায়।

—কোন ঘরে কে কে ছিলেন ?

—আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা ছিলাম পূবের ঘরে। আর আমার বড় ছেলে আর ছেলের বউ ছিল উত্তরের ঘরে।

—আপনার ছেলের বিয়ে হয়েছে কতদিন ?

এই প্রশ্ন শুনে হাকিম বলেন—এ প্রশ্নের কি কোন দরকার আছে ?

—আছে হুজুর।

এই বলে সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন—কই, বলুন !

—বছর দুই হলো বিয়ে হয়েছে ছেলের।

—আপনার ছেলের শ্বশুর বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, তাই না ?

—হ্যাঁ ! ওঁদের অবস্থা ভাল নয়।

—আপনার পুত্রবধূর কি কি গহনা আছে ?

—দুগাছা চুড়ী আর ঐ দুল দুগাছা।

—ঘরে সিঁদ কেটেছিল কি ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ ঘরে ?

—আমার ঘরে।

—সিঁদ কোন্ দিকে কেটেছিল ?

—উত্তর দিকে।

—যে জিনিসগুলো চুরি গিয়েছিল সেগুলো কিসের মধ্যে ছিল ?

—একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে।

—চোর কি ট্রাঙ্ক সুদ্ধ নিয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—আপনার বাড়িতে মোট কটা ট্রাঙ্ক ছিল সেদিন ?

—দুটো।

—দুটোই কি আপনার ঘরে ছিল ?

—না। একটি আমাদের ঘরে ছিল আর বাকিটি ছিল বৌমার ঘরে।

—আপনার বৌমা তাঁর কানের দুল জোড়া খুলে নিজের ঘরের বাক্সে না রেখে আপনার ঘরের বাক্সে রাখতে গেলেন কেন বলতে পারেন ?

পঞ্চানন বিব্রত হয়ে ওঠে এই প্রশ্নে। একটুখানি চিন্তা করে সে বলে—হয়তো সাবধানে রাখবার জন্যে আমার স্ত্রীর কাছে দিয়েছিল।

—দুল জোড়া কি ভাঙা ?

—না তো !

—তাহলে আপনার বৌমা কান থেকে ও দুটো খুললেন কেন ? চুরি যাবার সুবিধা করে দিতে কি ?

—কেন খুললে তা আমি কি জানি ! কানে ব্যথাও তো হতে পারে।

—তা পারে বই কি। আচ্ছা পঞ্চানন বাবু, আপনার স্ত্রীর আর কি কি গহনা আছে ?

—আর কিছু নেই।

—বেশ বেশ ! আচ্ছা, আসামী দেবেন দাসকে আপনি চেনেন কি ?

—চিনি বই কি

—ওঁকে কেমন লোক মনে হয়?

—আগে তো ভাল লোক বলেই জানতাম।

—এবারে হঠাৎ খারাপ লোক হয়ে গেছে, তাই না?

পঞ্চানন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না।

কিরণবাবু তখন আবার প্রশ্ন করেন—আপনার স্ত্রীর ঐ হারগাছার ওজন কত?

এই প্রশ্নে ঘেমে ওঠে পঞ্চানন। সে বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাতে আরম্ভ করে।

কিরণবাবু তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলেন—এদিক-ওদিক কি দেখছেন? হারের ওজন কত বলুন?

—আজ্ঞে, আড়াই ভরির মত হবে।

—আন্দাজ বাদ দিয়ে সঠিক ওজন বলুন।

—আজ্ঞে তিন ভরি থেকে সামান্য একটু কম হবে।

কিরণবাবু তখন হাকিমের কাছ থেকে হারগাছা নিয়ে ভাল করে বারকয়েক নেড়ে-চেড়ে দেখেন, তারপর সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার জেরা শুরু করেন।

তিনি প্রশ্ন করেন—হারগাছা কোথা থেকে তৈরি করিয়েছিলেন?

পঞ্চানন আবার এদিক-ওদিক তাকায়।

কিরণবাবু হো হো করে হেসে ওঠেন তার ভাবগতিক দেখে। পরে বলেন—আপনার জিনিস, আপনি কাকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন, সে কথাও কি বাইরের লোক এসে বলে দেবে নাকি?

পঞ্চানন ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আজ্ঞে, এটা হরিচরণ কর্মকারের তৈরি।

কিরণবাবু বলেন—আমি যদি বলি, হারগাছা কলকাতার কোন নামকরা জুয়েলারি ফার্মের তৈরি, আর তাদের নাম খোদাই করা আছে লকেটেরই পিছনে, তাহলেও কি আপনি বলবেন যে হরিচরণ কর্মকারেরই তৈরি ওটা?

কিরণবাবুর কথাগুলো বোমার টুকরোর মত আঘাত করে পঞ্চাননকে। সে তখন ভীত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

হাকিমও আশ্চর্য হয়ে যান এই কথা শুনে। কিবণবাবুর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করেন—বলেন কি মিঃ ব্যানার্জী! সত্যিই কি হারগাছা কলকাতার কোন নামকরা ফার্মের তৈরি?

—সত্যিই তাই, ইয়োর অনার। আপনি দয়া করে লকেটটা উল্টে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ওটা এম. বি. সরকারের দোকান থেকে তৈরি করা হয়েছে।

হাকিম তখন হারগাছা তুলে নিয়ে তার লকেটটা উল্টে দেখলেন একবার। তারপর পঞ্চানন দত্তের দিকে তাকিকে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন—কি ব্যাপার হে পঞ্চানন, এটা তো দেখছি এম. বি. সরকারের দোকানেই তৈরি। তুমি দেখছি ডাহা মিথ্যা কথা বলছ।

কিরণবাবু বললেন—আরও গোলমাল আছে, ইয়োর অনার। হারগাছার ওজন পাঁচ ভরির কম হবে না। অথচ পঞ্চানন বলছে তিন ভরির কম।

পঞ্চাননের মুখ শুকিয়ে উঠে হাকিম আর কিরণবাবুর কথা শুনে। বার বার সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।

তার দিকে তাকিয়ে কিরণবাবু আর একবার হো হো করে হেসে বলেন—খুব অসুবিধায় পড়ে গেছেন, তাই না পঞ্চাননবাবু! আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন।

পঞ্চানন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সে তখন তাড়াতাড়ি হাকিমকে নমস্কার করে কাঠগড়া থেকে নেমে আসে।

পঞ্চানন নামতেই কিরণবাবু বলেন—এবার হারগাছা ওজন করবার অনুমতি দিন, ইয়োর অনার।

কিরণবাবুর এই কথায় কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—হার ওজন করবার নিক্তি বা স্যাকরা তো এখন পাওয়া যাবে না। ও ব্যবস্থা সামনের তারিখে করা যেতে পারে।

কিরণবাবু বুঝতে পারেন, কোর্ট-ইন্‌সপেক্টার কাল হরণের নীতি অবলম্বন করছেন। তিনি তাই কোর্ট-ইন্‌সপেক্টারকে বাধা দিয়ে বলেন—নিক্তিসহ স্যাকরা বাইরে উপস্থিত আছে। আদালতের অনুমতি পেলে এখুনি তাকে হাজির করা যেতে পারে।

হাকিম বলেন—বেশ, তাকে নিয়ে আস্থন।

কিরণবাবু তখন রজতকে ডেকে বলেন—বাইরে যে স্যাকরাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে ডেকে নিয়ে আস্থন।

কিরণবাবুর নির্দেশে রজত বাইরে গিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একজন স্যাকরাকে এনে হাকিমের সামনে হাজির করে।

হাকিম জিজ্ঞেস করেন—তুমি স্যাকরা?

—আজ্ঞে হুজুর।

—তোমার কাছে ওজন করবার কাঁটা নিক্তি আছে?

—আছে হুজুর।

—বেশ, তুমি এই হারগাছা আমার সামনে ওজন করো।

স্যাকরা হারগাছা হাতে করেই বলে উঠে—এ হার আর ওজন করবার দরকার নেই, হুজুর। এর ওজন আমি জানি। সাড়ে পাঁচ ভরি সোনা আছে এতে।

হাকিম আশ্চর্য হয়ে বলেন—তার মানে?

স্যাকরা বলে—এ হার আমি চিনি, হুজুর। এটা জমিদার বাড়ির রানীমার হার। এই তো সেদিন আমি এটাকে মেরামত করেছি।

—তা হোক্, তুমি ওজন করো।

স্যাকরা তখন হারগাছা ওজন করে। তার কথাই ঠিক হয়। হারগাছার ওজন সত্যিই সাড়ে পাঁচ ভরি। ওজন করা হয়ে গেলে কিরণবাবু স্যাকরাকে জিজ্ঞেস করেন—এ হার কার বললে?

—রানীমার, হুজুর।

—রানীমা কে?

—আজ্ঞে রায়পুরের চৌধুরী বাড়ির কর্ত্রী-ঠাকরুণ।

—চৌধুরী বাড়ির কর্ত্রী ঠাকরুণ বলতে কি বুঝবো ? একটু স্পষ্ট করে বলো।

—আজ্ঞে, জমিদার নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন তিনি।

—স্ত্রী ছিলেন মানে ? এখন কি নেই নাকি ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর। গত বছর তিনি মারা গেছেন।

—তবে যে কিছুক্ষণ আগে বললে, কিছুদিন আগে হারগাছা তুমি মেরামত করেছ ?

—ঠিকই বলেছি, হুজুর। কয়েকদিন আগে ছোটবাবু এই হারগাছা আমার কাছে মেরামত করতে দিয়ে ছিলেন। হুজুর লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন হারগাছায় নতুন করে জোড় দেওয়া হয়েছে।

কিরণবাবু তখন আর একবার হারগাছা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন স্যাকরার কথাই ঠিক। সত্যিই একটি জায়গায় ঝালাই করা হয়েছে। ঝালাই-করা জায়গাটা হাকিমকেও তিনি দেখিয়ে দেন।

এরপর আর একটিমাত্র প্রশ্ন তিনি করেন স্যাকরাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন—ছোটবাবুটি কে বলো তো ?

স্যাকরা বলে—আজ্ঞে জমিদারবাবুর ছেলে সত্যরঞ্জনবাবু।

কিরণবাবু তখন স্যাকরাকে বিদায় দিয়ে হাকিমের দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করেন—ইয়োর অনার, আশাকরি আমার মক্কেল দেবেন দাসের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে আমি সক্ষম হয়েছি। চোরাইমাল-রূপে বর্ণিত যে হারগাছার জন্য দেবেনবাবুকে এক জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে, সেই হারগাছাই যখন চোরাইমাল নয়, সে অবস্থায় তাঁকে বেকসুর মুক্তি দিতে প্রার্থনা জানাচ্ছি আমি।

কিরণবাবুর কথা শুনে হাকিম বলেন—আপনার সঙ্গে আমি একমত মিঃ ব্যানার্জী। আসামী দেবেন দাসকে আমি এখুনি মুক্তি দেব। আমার এমনও সন্দেহ হচ্ছে যে, গোটা মামলাই একটা বিরাট মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয় আপনি কিছু আলোকসম্পাত করতে পারেন কি ?

হাকিমের কথায় কিরণবাবু মৃদু হেসে বলেন—পারি, ইয়োর অনার। কিন্তু আমি এসেছি দেবেন দাসের পক্ষ নিয়ে শুধু তাঁকেই এই ষড়যন্ত্র-মূলক মামলার জাল থেকে মুক্ত করতে। তাই সব-কিছু জেনেও আমি চুপ করে গেছি। কিন্তু আপনি যখন জানতে চাইছেন, তখন আর আমার বলতে বাধা নেই। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন যে, গোটা মামলাই এক বিরাট মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমি জানি যে, শুধু মিথ্যাচারই নয়, এর পেছনে আছে এক জঘন্য চক্রান্ত।

আমার মক্কেল দেবেনবাবুর একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। মেয়েটি পরমা সুন্দরী। রায়পুর গ্রামের কোন এক বিশেষ ব্যক্তি চেষ্টা করে মেয়েটির সর্বনাশ করতে। কুটনী পাঠিয়ে মেয়েটিকে সে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। মেয়েটি কিন্তু তার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।

এরপর সে চেষ্টায় থাকে দেবেনবাবুকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে। তার মনে হয় যে, দেবেনবাবুকে যদি বেশ কিছুদিনের জন্য জেলে আটকে রাখা যায় তখন অতি সহজেই কার্যোদ্ধার করা যাবে। এই কথা মনে হ'তেই সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কাজে নেমে পড়ে। দাগা চোর পিয়ার মহম্মদকে সে টাকা খাইয়ে চুরির কথা স্বীকার করতে রাজী করে। পঞ্চানন দত্তকে দিয়ে মিথ্যা এজাহার সে-ই দেওয়ায়। আসলে পঞ্চাননের বাড়িতে চুরিই হয়নি। পঞ্চানন দত্তের মত হীন অবস্থার লোকের বাড়িতে চুরি করবার ইচ্ছা পিয়ার মহম্মদের মত পাকা চোরের কখনও হবার কথা নয়। কিন্তু সেই অঘটনই ঘটতে দেখা যায় এই মামলায়। এর পরেই আসছে চোরাই মালের ব্যাপার। এটা একটা সামান্য ব্যাপার। আসলে ঐ হারগাছা যে পঞ্চানন দত্ত কোনদিন চোখেও দেখেনি সে কথাতো একটু আগেই প্রমাণিত হয়েছে। এখন তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কি করে ঐ হারগাছা দেবেন দাসের বাড়িতে গেল। এর উত্তরে আমি বলতে চাই যে, সেই বিশেষ ব্যক্তিটির পক্ষে হারগাছা অন্য কোন লোকের হাত দিয়ে দেবেন দাসের বাড়ির

কোন নির্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে রেখে আসা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

যাহোক আমার এখন দুঃখ হচ্ছে বেচারা পিয়ার মহম্মদের জন্য। চুরি না করেও ওকে আজ জেলে যেতে হবে চুরির দায়ে। এ বিষয় আপনারও কিছু করবার নেই। ওর বাড়ি থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে এবং ও নিজ মুখে চুরি ক'রেছে বলে স্বীকার করেছে। এগুলো বোধহয় আমাদের আইনেরই ত্রুটি। আর আইনে এইসব ত্রুটি আছে বলেই এই মামলায় উদ্ভাবকের মত জঘন্য চরিত্রের ব্যক্তিও সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে বেড়াতে পারে।

কিরণবাবুর বক্তৃতা শেষ হলে হাকিম বলেন—আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ ব্যানার্জী। অনেক সময় আসল অপরাধীরাই আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর আমরা সবকিছু বুঝেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হই। যাহোক, আপনার মক্কেলকে আমি বেকসুর খালাস দিলাম। সত্যিই ওকে আর এ মামলায় ঝুলিয়ে রাখবার কোন অর্থ হয় না।

এই বলে অর্ডার সিটের ওপর হুকুম লিখে পেস্কারের হাতে দিলেন তিনি।

পেস্কারবাবু সেটা পড়ে দেখে উচ্চকণ্ঠে বললেন—আসামী দেবেন দাস, বেকসুর খালাস। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৫ই জুলাই।

এই সময় আসামীর কাঠগড়া থেকে পিয়ার মহম্মদকে বলতে শোনা যায়—"লে হালুয়া। দেবেন দাস বেরিয়ে গেল! এখন আমি শালা বেকসুর জেল খেটে মরি!"

॥ দশ ॥

পূর্বোক্ত ঘটনার তিন দিন পরের কথা।

দেবেন দাসের বাড়ির দাওয়ায় বসে কথা হচ্ছে রজত আর দেবেন দাসের মধ্যে।

দেবেন দাস বলছিলেন—আমাকে তো বের করে আনলে, বাবা, কিন্তু মেয়েটার উপায় কি করি বলো তো? আমি তো আর সব সময় ওকে আগলে বসে থাকতে পারব না। কবে যে ছোটবাবুর লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে যায়, সেই ভয়েই আমি অস্থির হয়ে আছি।

ব্যাপারটা নিয়ে রজতও যে চিন্তা করেনি তা নয়। কিন্তু চিন্তা করে এ সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধানের পথ সে খুঁজে পায়নি।

একবার অবশ্য তার মনে হয়েছিল যে, কল্যাণীকে সে যদি বিয়ে করে তাহলে সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। কল্যাণীকে তার পছন্দও হয়েছিল খুব। কিন্তু কেন যেন সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি সে। তার এমন কথাও মনে হয়েছিল যে, কথাটা সে কল্যাণীকেই বলবে, কারণ এখন আর কল্যাণী তাকে লজ্জা করে না। সহজভাবেই সে কথাবার্তা বলে রজতের সঙ্গে। কিন্তু দু' তিন দিন চেষ্টা করেও কথাটা সে বলতে পারেনি।

দেবেনবাবুর কথা শুনে হঠাৎ তার মনে হ'ল এই সুযোগেই কথাটা বলে ফেললে মন্দ হয় না। সে তাই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললো—ও ব্যাপারটা আমিও চিন্তা করেছি, কিন্তু কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাইনি। অবশ্য একেবারেই যে পথ পাইনি তা নয়। একটা উপায় আছে যা করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

—কি, কি উপায় বলো তো, বাবা?

—উপায়টা হ'ল, কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে দেওয়া।

সমস্যা সমাধানের এই সহজ উপায়টা কিন্তু দেবেনবাবুর কাছে খুব

সহজ বলে মনে হ'ল না। উপায়টা তার পক্ষে নিরুপায়েরই সামিল। মেয়ের বিয়ে দেবার মত টাকা কোথায় তাঁর ?

দেবেনবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে রজত বলে—কি ভাবছেন বলুন তো ?

—ভাবছি আমার অদৃষ্টের কথা। মেয়ের বিয়ে দেবার মত টাকা কি আমার আছে ? ও কথা তাই আমি চিন্তাও করি নে।

—আমার ত মনে হয়, কল্যাণীর মত মেয়ের বিয়ে টাকা ছাড়াও দেওয়া যায়।

—হয়তো যায়, কিন্তু সে দোজবর বা তেজবরে। ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিতে হলে কমসে-কম হাজার টাকা খরচ ; তাতেও কুলোবে কিনা সন্দেহ।

এই বলে একটু চুপ করে দেবেনবাবু আবার বলেন—আমার মত হতদরিদ্রের ঘরে এসে মেয়েটার জীবন দুঃখে দুঃখেই যাবে দেখছি।

দেবেনবাবুর এই কথার উত্তরে রজত হঠাৎ বলে বসে—আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি কল্যাণীকে।

—কি বললে বাবা ! তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো না তো ?

—ঠাট্টা করছি ! আপনার এরকম মনে হবার কারণ ?

—কারণ আছে বইকি, বাবা ! তোমার মত ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবার জন্য কত বড় বড় রাজা জমিদার হা করে রয়েছে সে কথা কি তুমি জানো না ?

—জানি বইকি ! কিন্তু কে কোথায় হা করে রয়েছে দেখেই যে আমি সেই হা-টার মধ্যে ঢুকে যাবো সে কথাই বা কি করে ভাবলেন আপনি ? আমার ইচ্ছা, আমি যাকে বিয়ে করব, তাকে আমি নিজে পছন্দ করেই নেব। যাহোক, আপনার মতামত আজ সহজ ও সরলভাবে জানতে চাইছি। আমার সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?

—আমার আপত্তি? এ তুমি কি বলছ, রজত? তোমার মত জামাই পাবো, এযে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু....

—আবার কিন্তু কিসের?

—কিন্তু হচ্ছে টাকার। বিয়ের খরচের সংস্থানও যে আমার নেই, বাবা!

—সেজন্য আপনাকে মোটেই ভাবতে হবে না। সে ভার আমার ওপরে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি।

রজতের কথা শুনে দেবেনবাবু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। উচ্চকণ্ঠে স্ত্রীকে ডেকে বলেন তিনি—ওগো শুনছো!

স্বামীর ডাক শুনে গৌরীদেবী ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেন—কি বলছো?

—বলছি, তোমার মেয়ের সৌভাগ্যের কথা। মেয়ে তোমার রাজরানী হতে চলেছে। রজত বাবাজী ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে আমাকে।

—কি বললে! রজত আমার জামাই হবে, এত সুখ কি বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেছেন?

এই সময় রজত বলে—আপনি নিজেকে অতটা ছোট করে দেখবেন না, মা। দুনিয়ায় টাকা পয়সাটাই সব নয়। আমার মতে মনুষ্যত্বই সব চেয়ে বড় জিনিস। কবি চণ্ডীদাস বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।" এই সত্যকেই আমি চরম সত্য বলে স্বীকার করি। আমার বিচারে তাই সত্যদা পশু আর আপনারা দেবতা।

রজতের কথা শুনে গৌরীদেবীর বুকের ভিতরে আনন্দের ঝরণা-ধারা বইতে থাকে। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দু' চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এ আনন্দ তাঁর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, রজত রাজী হলেও তাঁর মা হয়তো বাধা দিতে পারেন। কথাটা মনে হতেই কেমন যেন মুষড়ে পড়েন তিনি।

দেবেনবাবু বলেন—কি গো! তুমি যে একেবারে চুপ করে গেলে! কি ভাবছ অতো?

—ভাবছি অনেক-কিছু। আমার মনে হচ্ছে, এ বিয়েতে অনেক বাধা আসবে।

গৌরী দেবীর কথার উত্তরে রজত বলে—ঠিকই বলেছেন আপনি। এখানে দুষ্ট লোকের অভাব নেই। তারা হয়তো একটা ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করবে।

গৌরী দেবী বলেন—এখানকার লোকেরা ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করবে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আমি ভয় পাইনে। আমার ভয় হচ্ছে, তোমার মায়ের কথা মনে ক'রে। তিনি কি রাজী হবেন এ বিয়েতে?

রজত বলে—আমার মাকে আপনি জানেন না বলেই ও কথা বলতে পারলেন। এ বিয়েতে মা-ই খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।

—ঠিকই বলেছ, বাবা। তোমাকে দেখেই তোমার মাকে চিনে নেওয়া উচিত ছিল আমার! আমি ভাবছি···

গৌরীদেবীর কথায় বাধা দিয়ে দেবেনবাবু বলেন তোমার ভাবনা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে কাজের কথা বলতে দাও আমাকে.

এই বলে রজতের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলেন—বিয়ের আগে তোমার মাকে নিয়ে আসতে হবে তো, বাবা!

—না। আমি ভাবছি, বিয়ে আমাদের হাজারীবাগের বাড়িতেই হবে। এখানে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে।

দেবেনবাবু বলেন—ঠিকই বলেছ বাবা, আমার মেয়ের ওপরে যাদের কুদৃষ্টি আছে, তারা আমার এই সৌভাগ্যকে সুনজরে দেখবে না। হয়তো এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে তারা যে, বিয়েটাই যাবে পণ্ড হয়ে। আমারও তাই মনে হয়। বিয়েটা এখানে না হওয়াই ভাল।

স্বামীর কথা শুনে গৌরীদেবী বলে উঠেন—সে কি গো! মেয়ের বিয়ে বাড়িতে হবে না? আমি কি তাহলে একা-একা শত্রুপুরীতে বসে থাকবো বিয়ের সময়?

রজত বলে—না, না, আপনি এখানে থাকবেন কেন? আপনাদের সবাইকে আমি নিয়ে যাবো ওখানে।

গৌরীদেবী বলেন—সেটা খুবই খারাপ দেখাবে, বাবা। তুমিবা তোমার মা হয়তো কিছু মনে করবেন না কিন্তু প্রতিবেশীদের মুখ তো ঠেকাতে পারবে না। এই নিয়ে হয়তো তারা নানান্ কথার সৃষ্টি করবে।

—আপনি তাহলে কি করতে বলেন?

—আমি বলি, কল্যাণীকে নিয়ে উনিই শুধু যান। তবে উনিও যেন সম্প্রদানের কাজ সেরেই চলে আসেন!

রজত বলে—তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। আমরা বরং কালই রওনা হই, কি বলেন?

রজতের প্রস্তাব শুনে দেবেনবাবু বলেন—বিয়ের দিনটা ঠিক করে গেলে ভাল হতো, বাবা। আমি তাহলে বিয়ের দিন বা তার আগের দিন গিয়ে হাজির হতে পারতাম। আমি তাই বলি, বিয়ের দিন ঠিক করে কল্যাণীকে নিয়ে তুমি চলে যাও। আমি পরে যাচ্ছি।

রজত বলে—বেশ, আপনি তাহলে দিন দেখুন।

দেবেনবাবু তখন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—পাঁজীখানা একবার দাও তো! দিনটা ঠিক করে ফেলি।

গৌরী দেবী ঘর থেকে পাঁজী এনে স্বামীর হতে দিতেই তিনি সাগ্রহে পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করেন। দিন ঠিক করতে দেরি হয়না তাঁর। ফাল্গুন মাসের বিয়ের তারিখগুলি দেখে নিয়ে তিনি বলেন—বারই ফাল্গুন দিনটা খুব ভাল দেখছি। ঐ তারিখেই বিয়ে হোক, কেমন?

—বেশ, ঐ তারিখেই হতে পারে। আমরা তাহলে কালই রওনা হই, কি বলেন?

এই সময় ঘরের ভিতর থেকে অজিত হঠাৎ বেরিয়ে এসে আব্দারের সুরে বলে—আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাব, রজতদা!

রজত হেসে বলে—নিশ্চয়ই যাবে।

দেবেন বাবু আর গৌরীদেবীর দিকে তাকিয়ে সে আবার বলে—আজ তাহলে উঠি। কাল সকালে একেবারে তৈরি হয়ে আসবো।

রজত চলে যেতেই দেবেন বাবু বলেন—তোমার হাতের চুড়ি দুটো খুলে দাও তো।

গৌরীদেবী অবাক হয়ে বলেন—চুরি দিয়ে কি করবে?

—কি আশ্চর্য! জামাইয়ের জন্য আংটি তৈরি করতে হবে, সে কথা কি ভুলে গেলে?

—ও মা, তাইতো! আংটি তো চাই-ই।

এই বলে হাত থেকে চুড়ি দুগাছা খুলে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—এই নাও।

দেবেন বাবু চুড়ি দুগাছা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন স্যাকরা বাড়ির উদ্দেশে।

দেবেন বাবু চলে যেতেই গ্রামের যদু মিত্তিরের বউ আর নরেন সরকারের পিসি এসে হাজির হয় সেখানে।

যদু মিত্তিরের বউএর সঙ্গে গৌরীদেবী সই পাতিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। তাই, তাঁকে দেখে খুশি হয়ে ওঠেন গৌরীদেবী। তিনি বলেন—এই যে সই! কবে এলে মেয়ের বাড়ি থেকে? বসুন পিসিমা!

মিত্তির গিন্নী বলেন—অঞ্জুর বাবা ছাড়া পেয়েছেন শুনে খবর নিতে এলাম। আজই মেয়ের বাড়ি থেকে এসেছি।

—বুলু কেমন আছে সই?

—এখন ভালই আছে। বাঁচবার কি আর আশা ছিল! টাইফয়েড হয়েছিল মেয়ের। তা ধন্যি জামাই আমার। শহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়েছে মেয়েকে। ওষুধের দাম যদি শোনো সই তাহলে তোমার ভিরমি লাগবে। 'কেলোর-মাই-সিটি' না কি বলে,

এক একটা ওষুদের দাম লেগেছে শতের টাকা করে, সাতটি ঐ ঔষুদ খাওয়াতে হয়েছে মেয়েকে। তা, এদিকে কি হয়েছিল বলো তো ?

—সবই বলছি সই। জানো তো এ গাঁয়ের কথা। জমিদারের ছেলের কুদিষ্টি পড়েছিল আমার মেয়ের ওপর। পথের কাঁটা মনে করে সে-ই ষড়যন্ত্র করে মিথ্যে মামলায় ওঁকে হাজতে ভরে দেয়। কি যে হ'তো ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। কিন্তু ভগবানই রক্ষাকর্তা ; নইলে রজত এসে সব ঝুঁকি নিজের মাথায় নিয়ে ওঁকে খালাস করে আনবে কেন ?

—রজত কে সই ?

—রজতকে চেনো না সই। রায়পুরের জমিদারির অর্ধেকের মালিক সে। জমিদার নরেনবাবুর বড়দার ছেলে।

— তা কি জানি, সই। আগে তো একে দেখিনি কোনদিন ! তবে আমার কথা হল, জমিদার-টমিদারদের সঙ্গে মেলামেশা যত কম হয় ততই ভাল।

—রজতকে তুমি জানো না, সই ! তার মত ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অতবড় জমিদারির অর্ধেকের মালিক হয়েও একটু দেমাক নেই তার।

— তা হবে হয়তো। কিন্তু এঁর মনে কি আছে তাই বা কে জানে ! তুমি ভাই মেয়েকে একটু সামলে রেখো ও সব লোকের নজরের সামনে থেকে।

সইয়ের কথায় হেসে উঠে গৌরীদেবী বলেন—সে আর হয়ে উঠবে না সই। আর ক'দিন পর থেকে ওরা দুজনে দুজনকে সব সময় চোখে চোখেই রাখবে। সামনের···

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ চুপ করে যান গৌরীদেবী। তাঁর মনে হয়, এ সব কথা এখন না বলাই ভাল।

মিত্তির গিন্নী বলেন—বলতে বলতে কথাটা লুকিয়ে ফেললে কেন সই ?

—না লুকোবো কেন? আর তাছাড়া লুকোবার আছেই বা কি? সামনের মাসের বার তারিখে রজতের সঙ্গে আমার কল্যাণীর বিয়ে।

নরেন সরকারের পিসি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এ কথা শুনবার পর আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে।

তিনি বলেন—বলো কি বউ! এ কি সত্যি?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে কথা বলছি নাকি আপনাদের সঙ্গে?

এই বলে মিত্তির গিন্নির দিকে তাকিয়ে বলেন—সত্যি সই, আমার মেয়ের ভাগ্যে যে এমন বর জুটবে সে কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সইয়ের ভাগ্যের কথা শুনে মনে মনে ঈর্ষান্বিতা হয়ে ওঠেন মিত্তির গিন্নী।

ঈর্ষান্বিতা হবার কথাই যে! দিন এনে দিন খেয়ে যাদের সংসার চলে তাদের মেয়ের এই রকম সম্বন্ধের কথা শুনে কি ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারে! ওঁরা তাই আর বেশি দেরী না করে উঠে পড়েন সেখান থেকে।

বাড়ি ফেরবার পথে গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে খবরটা জানিয়ে দেন দুজনে। বোসেদের বাড়ির বড় বউ তো কথাটা বিশ্বাস করতেই চায় না। অবশেষে সব কথা শুনে মন্তব্য করে—অমন ঢলানি মেয়ে পেটে ধরলে জমিদার কেন, কত রাজা-রাজড়া পর্যন্ত বাড়ির আনাচে কানাচে এসে ঘোরাঘুরি করে।

দেখতে দেখতে গাঁময় রাষ্ট্র হয়ে যায় কথাটা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই গ্রামের লোকেরা একে একে আসতে থাকে দেবেনবাবুর বাড়িতে।

যোগেন সরকারের পাঁচটি মেয়ে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, দেবেন দাস জমিদার বাড়ির ছেলেটাকে তুক্ তাক্ করেছে।

সে এসে দেবেনবাবুকে একান্তে ডেকে নিয়ে গলাটা খাটো করে বলে—কি করে তুক্ করলে ভায়া?

দেবেন বাবু যতই বলেন তুক্‌তাকের কোন ব্যাপারই নেই এর ভিতরে, কিন্তু কে তাঁর কথা বিশ্বাস করে! তুক্ তাক্ না করলে কি অতোবড় জমিদারের ছেলে বিনাপণে দেবেন দাসের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়!

অচিরেই গ্রামময় রটে গেল, দেবেন দাস জমিদার বাবুর ভাইপোকে তুক্ করেছে।

॥ এগার ॥

পরদিন সকালে একেবারে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে রজত হারীঘরে যায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

নরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে সব কথাই শুনে নিয়েছেন গ্রামের লোকদের কাছে। তারা উপযাচক হয়ে এসেই খবরটা জানিয়ে গেছে তাঁকে।

রজত আসতেই তিনি তাই গম্ভীর হয়ে যান।

রজত তাঁকে প্রণাম করে বলে—আমি এখুনি রওনা হচ্ছি, কাকা। আপনি আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিন তো।

নরেন্দ্রনাথ খাজাঞ্চী বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন—রজতের নামে লিখে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিন!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাজাঞ্চী বাবু এক তাড়া নোট এনে রজতের হাতে দেয়।

নোটগুলো গুণে নিয়ে ব্যাগের ভিতরে রেখে রজত বলে—আর কবে দেখা হবে জানি না, কাকাবাবু। হয়তো আর এখানে আসাই হবে না আমার। তাই বলছি, এর পর থেকে আমাদের অংশের টাকাটা মাসে মাসে মনিঅর্ডার করে হাজারীবাগের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলেন—বেশ, তাই হবে।

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বলেন—কিন্তু কাজটা কি ভাল

করলে, রজত? দেবেন দাসের মত লোকের মেয়েকে বিয়ে করলে যে, আমাদের বংশের মুখে চুনকালি পড়বে সে জ্ঞানটা অন্তত তোমার থাকা উচিত ছিল।

—কথাটা যখন তুললেনই, তখন আমার বক্তব্যটাও শুনে নিন, কাকা। দেবেন বাবুর মেয়েকে আমি বিয়ে করছি ঠিকই। কিন্তু কেন বিয়ে করছি সে কথাটা বোধ হয় জানেন না?

—সে কথা জানবার আমি প্রয়োজন বোধ করি না।

—প্রয়োজনবোধ না করলেও শুনে রাখুন। দেবেনবাবুর মেয়ের সর্বনাশ করবার জন্য আপনার ছেলে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে, মেয়েটাকে হাত করবার উদ্দেশ্যে একটা মিথ্যা মামলা খাড়া করে, দেবেনবাবুকে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থাও আপনার ছেলেরই কীর্তি। তাছাড়া, পাঁচু বাগদীর দলকে দেবেনবাবুর বাড়িতে ডাকাতি করতে কে পাঠিয়েছিলেন এবং কি জিনিস ডাকাতি করে নিয়ে আসতে বলেছিলেন, সে কথা পাঁচুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। তাহলে বুঝতে পারছেন যে, আপনার ছেলের অত্যাচার থেকে একটি নিষ্পাপ কুমারী মেয়েকে রক্ষা করবার জন্যই তাকে আমি বিয়ে করছি। এসব কথা আপনার কাছে কোনদিনই বলতাম না; আর বিয়ের কথাটা আপনাকে এখন জানাবারও আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু খবরটা ইতিমধ্যেই আপনার কানে এসে পৌঁছেছে দেখে এবং আপনি ও-সম্বন্ধে কথা তুললেন বলেই বাধ্য হয়ে এসব বলতে হ'ল।

রজতের এই দীর্ঘ অভিযোগ শুনে নরেন্দ্রনাথ বলেন—তুমি বলছো কি রজত! সত্য এতদূর নিচে নেমে গেছে?

—গেছেন কিনা একটু খোঁজ নিলেই তা জানতে পারবেন। এখনও দেবেনবাবুর মামলা শেষ হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা কি ভাবে সাজাবার চেষ্টা সত্যদা করেছেন সে প্রমাণ কোর্টের নথিপত্র থেকেই পাবেন। আপনার স্ত্রীর হার পঞ্চানন দত্তের স্ত্রীর চোরাই হার বলে চালিয়ে দেবার

চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু উকিল কিরণবাবুর জেরায় হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে রজত আবার বলতে শুরু করে—তাছাড়া আপনিও আমার বিরুদ্ধে কম লাগেননি, কাকা।

—আমি! তোমার বিরুদ্ধে লেগেছি?

—হ্যাঁ কাকা, আপনিও লেগেছেন। কয়েকজন চাটুকারকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে থানায় গণ্ডা ছুই ডায়েরীও আপনি করিয়েছেন। আমি নাকি সরকারের বিরুদ্ধে এখানকার যুবকদের ক্ষেপিয়ে তুলছি।

—এসব কথা যে তোমাকে বলেছে সে মিথ্যা কথা বলেছে।

—মিথ্যা কথা সে মোটেই বলেনি কাকা। সে যাইহোক, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে আজ যদি আপনারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারেন তাহলে ভবিষ্যতে যে বিপর্যয়ের মুখে পড়বেন তা থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। যে জমিদারির আপনি বড়াই করেন তাও থাকবে না। আজ না হোক্ পাঁচ বছর কি বড়জোর দশ বছর পরে এ দেশ সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাবে, একথা আপনি লিখে নিতে পারেন। তাই বলছি, দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে চেষ্টা করুন মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখুন। হ্যাঁ আর একটা কথা, প্রজাদের জন্য যে সব কল্যাণমূলক কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম, যদি পারেন সেগুলোকে চালু রাখবেন। আচ্ছা কাকা, আমি তাহলে যাই।

এই বলে আর একবার নরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করে রজত কাছারী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রজত যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ নরেন্দ্রনাথ পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন। কিন্তু সে চলে যেতেই তিনি যেন সম্বিত ফিরে পান। নায়েব গোমস্তার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন—ছোকরার লেকচারটা শুনলেন তো আপনারা?

নরেন্দ্রনাথের কথায় নায়েব হরিমোহন দাঁত বের করে হেসে বলেন—শুনলাম বই কি, কর্তা!

—কি বুঝলেন ?

—বুঝলাম অনেক কিছুই।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, বেশি লেখাপড়া শিখে বাবাজীর মাথাটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে। জমিদারের ছেলের মুখে এরকম কথা কেউ কোনদিন শুনেছে বলে তো মনে হয় না।

—কিন্তু ও যে বললে, জমিদারি থাকবে না ; সে সম্বন্ধে আপনাদের কি মত ?

—হ্যাঁ, এইরকম একটা কথা মাঝে মাঝে দেখি বটে কাগজে, কিন্তু তাতে তো ভয় পাবার কিছু দেখছি না।

—কেন বলুন তো ?

—কারণ, সরকার যদি জমিদারি নিয়েও নেয়, তাহলেও বিনা খেসারতে নেবে না ; আর, সে খেসারতের টাকাও খুব কম হবে না। আমার মনে হয়, খেসারতের টাকায় কলকাতার মত শহরে খান কয়েক বড় বড় বাড়ি কিনে ভাড়া দিলে জমিদারির আয় থেকে কোন অংশেই কম হবে না।

—কিন্তু দেশটা যদি সমাজতান্ত্রিক হয়ে যায় ?

—তা হবে না, কর্তা।

—কেন হবে না ?

—হবে না তার কারণ কংগ্রেসকে যারা এতদিন অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবার মত সাহস নেতাদের নেই। চোখের ওপরেই তো দেখতে পাচ্ছেন, ধনীরা আজ যা খুশি তাই করছেন। লাখ লাখ টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিলেও তাঁদের গায়ে আঁচড় লাগে না। গুদামে মাল মজুত করে রেখে তাঁরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছেন, তাঁদের কারখানায় উৎপন্ন জিনিসের দাম দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলছেন ; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কি করতে পেরেছেন তাঁদের ? নেতারা ভাল করেই জানেন যে, ধনীদের পেছনে লাগতে

গেলে পরদিনই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হবে তাঁদের বিরুদ্ধে। ভারতে এমন অনেক ধনী আছেন যাঁরা ইচ্ছে করলে সাতদিনের মধ্যে যে কোন মন্ত্রী-সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করাতে পারেন। টাকার জোরেই ভোট কিনে নিতে পারেন তাঁরা।

—অর্থাৎ আপনি তাহলে বলতে চান, এদেশে সমাজতন্ত্রবাদ কোনদিনই প্রতিষ্ঠা হবে না?

—হতে পারে, তবে বিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে হবে না এ কথা জোর দিয়েই বলতে পারি আমি।

—নায়েব মশাইর কথা শুনে মনে বল পান নরেন্দ্রনাথ। তিনি তখন রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তোলেন।

তিনি বলেন—আচ্ছা নায়েব মশাই, সত্যর স্বভাবচরিত্র কি খুবই খারাপ হয়ে গেছে?

নরেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নে নায়েব মশাই বেশ একটু বিব্রত বোধ করেন। কি বলা যায় তা তিনি ভেবেই ঠিক করতে পারেন না।

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে নরেন্দ্রনাথ আবার বলেন—রজত যা বলে গেল সে তো বড় সাংঘাতিক কথা!

নায়েব মশাই চতুর লোক। হাওয়ার গতি দেখে তিনি দিক্ নির্ণয় করেন। নরেন্দ্রনাথের কথার হাওয়া কোনদিকে বইছে বুঝবার জন্য তিনি তাই "এ্যাও হয় অ-ও হয়" গোছের উত্তর দেন।

তিনি বলেন—আজ্ঞে তা তো বটেই।

নরেন্দ্রনাথ বলেন—আমার স্ত্রীর নেকলেশের বিষয় ছোকড়া যে কথা বলে গেল, সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নেবেন তো?

—আজ্ঞে সে খবর আমার আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বেশ একটু জটিলই হয়ে উঠেছে।

—কি রকম?

—আজ্ঞে থানার কাগজপত্রে ওটাকে চোরাই মাল বলে লেখা হয়েছে। দারোগাবাবু দেবেন দাসের বাড়িতে খানাতল্লাসী করবার

সময় ঐ হার তার বাড়িতে পেয়েছেন এইরকমভাবে সাজানো হয়েছিল কেসটা ; কিন্তু কিরণ ব্যানার্জীর জেরার মুখে পঞ্চানন দত্ত সব গড়বড় করে দিয়েছে।

—তাহলে তো বড় ভাবনার কথা, নায়েব মশাই।

—আজ্ঞে, তা তো বটেই। মনে হয় বেশ কিছু খরচ করতে হবে এ ব্যাপারে।

—খরচ করা যদি দরকার মনে করেন ,নিশ্চয়ই করবেন। বিষয়টা নিয়ে যাতে কোনরকম গোলমাল না হয় সে ভার আপনার ওপরেই দিচ্ছি আমি।

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে নায়েব মশাই মনে মনে খুশি হন। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, ঐ হারগাছাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু টাকা তার পকেটে এসে ঢুকবে।

তিনি তাই আশ্বাস দিয়ে বলেন- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তা, আমি থাকতে আপনার বা ছোটবাবুর কোনই চিন্তা নেই।

নায়েব মশাইয়ের কথায় আশ্বস্ত হয়ে নরেন্দ্রনাথ বিষয়কর্মে মন দেন।

॥ তের ॥

এদিকে যখন এইসব ব্যাপার চলছে, ওদিকে মাইনিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের খনিতে তখন আরম্ভ হয়েছে বিরাট ধর্মঘট। ম্যানেজারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে এবং মজুরী ও অন্যান্য সুখ সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে খনির শ্রমিকরা ইউনিয়ন গড়ে ধর্মঘট আরম্ভ করেছে।

ধর্মঘট এমন ব্যাপক আকারে চলেছে যে, এক মাসের ওপর খনি থেকে এক ছটাক মাইকাও তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে, দৈনিক প্রায় হাজার টাকা করে লোকসান হচ্ছে কোম্পানির।

এই ধর্মঘটের গোড়ায় একটি কলঙ্কজনক ইতিহাস আছে।

ইতিহাসটি হ'ল, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর দুজন স্বার্থান্বেষী ডিরেক্টার কোম্পানিটাকে গ্রাস করবার চেষ্টায় থাকে। অন্যান্য ডিরেক্টারেরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে কোন খবরই রাখে না।

যে দুজন স্বার্থান্বেষী ডিরেক্টারের কথা বলা হ'ল, তাদের একজন বিহারী আর একজন মাড়োয়ারী। বিহারী ভদ্রলোকের নাম চতুরানন সিং আর মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের নাম বলদেওদাস শেঠিয়া। চতুরানন বিহারের একজন শিল্পপতি। একটা পটারী, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং একটা চিনা মাটির খনির মালিক সে।

বলদেওদাস ব্যবসায়ী। চাল, গম, চিনি, কাপড় ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের পাইকারী কারবার করে সে। শুধু তাই নয়, ঔষধপত্র, লোহা, সিমেণ্ট, চিনি, গুড় এবং আরও নানারকম জিনিস সে কেনা-বেচা করে। বিগত যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক মার্কেটিং করে প্রায় কোটি টাকা সে রোজগার করেছিল। তারপর স্বাধীনতার ফসল কুড়িয়ে সেই কোটি টাকাকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে।

এবারে তার ইচ্ছা হয়েছে শিল্পপতি হবার। সে বুঝতে পেরেছে, ব্যবসায়ীর চেয়ে শিল্পপতির কদর বেশি। তাছাড়া তেমন তেমন শিল্প স্থাপন করতে পারলে লাভও হয় প্রচুর।

মাইনিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টার হবার পর থেকেই ব্যাপারটা সে ভালভাবে বুঝতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সে তাই এগিয়ে আসে কোম্পানিটাকে গ্রাস করার মতলবে।

এর পরেই আরম্ভ হয়ে যায় স্বার্থের সংঘাত। চতুরাননের চাতুর্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধে বলদেওদাসের টাকার।

ব্যাপার দেখে পদস্থ কর্মচারীরা দুহাতে লুঠতে শুরু করে। তারা একবার একে উস্কিয়ে আর একবার ওকে উস্কিয়ে গোলমাল জিয়িয়ে রাখে, আর সেই সুযোগে ইচ্ছামত লুঠতরাজ চালাতে থাকে। এই ঢালাও লুঠের কারবারে প্রধান দুই অংশীদার রূপে আত্মপ্রকাশ করে খনির ম্যানেজার নীলরতন সেন ও হিসাবরক্ষক নিলমণি সামন্ত। এই দুই রতন-মণিতে মিলে শ্রমিকদের বেতনের খাতায় মিথ্যা নাম লিখে, মালের হিসাব কম দেখিয়ে এবং খরচের হিসাব বেশি দেখিয়ে দু-হাতে লুণ্ঠন চালিয়ে যায়। শুধু এই নয়, শ্রমিকদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করে তারা। বেছে বেছে কয়েকজনকে সর্দারশ্রেণীতে উন্নীত করে তাদের সাহায্যেই ভেদনীতির চক্রান্ত সৃষ্টি করে ম্যানেজার নীলরতন।

নীলরতনে আবার অন্যান্য গুণও আছে। কামিনদের মধ্যে কাউকে তার মনে ধরলে যেমন করে হোক তাকে সে উপভোগ করে।

মাস দুই আগে রভিয়া নামে এক অষ্টাদশী কামিনকে সে তার বাড়িতে ডেকে এনে দিনদুপুরে বলাৎকার করে। মহল্লায় ফিরে রভিয়া সব কথা ফাঁস করে দেয়। সে সাঁওতাল পুরুষদের ভেড়ার পালের সঙ্গে তুলনা করে বলে যে, তাদেরই চোখের সামনে তাদের মা-বহিন-জরুরা বে-ইজ্জতি হচ্ছে আর তারা ভেড়ার মত অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখছে। রভিয়া আরও বলে যে, খনিতে তারা গতর খাটাতে এসেছে, ইজ্জত বিক্রি করতে আসেনি।

রভিয়ার কথায় সাঁওতাল পুরুষদের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। তারা দল বেঁধে হাজির হয় ম্যানেজারবাবুর কুঠিতে।

ম্যানেজার বেরিয়ে আসে বন্দুক হাতে নিয়ে। বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখায় সে শ্রমিকদের। বলে, এই মুহূর্তে চলে না গেলে সে গুলি চালাবে।

সাঁওতালরা কিন্তু সরতে চায় না। তারা বলে, রভিয়াকে বে-ইজ্জত করার খেসারৎ ম্যানেজারকে দিতে হবে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে তার

কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে এবং নগদ দুশ' টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হবে।

তাদের কথা শুনে নীলরতন ক্ষেপে ওঠে। টাকার পরিবর্তে বুলেট দিয়ে উত্তর দেয় সে। দুইজন শ্রমিক মারা যায় তার গুলির আঘাতে। শ্রমিকরা তখন থানায় গিয়ে এজাহার দেয়।

এজাহারের ফলে দারোগা আসে, এনকোয়ারী হয়, ম্যানেজারের ঘরে বসে উচ্চ হাসির রোলের মধ্যে খানাপিনা চলে, কিন্তু আসলে হয়না কিছুই। ওরা ভেবেছিল যে, ম্যানেজারকে আসামী করে সরকার থেকে মামলা চালানো হবে, কিন্তু কার্যকালে তা তো হ'লই না, মাঝখান থেকে যে কজন লোক থানায় এজাহার দিতে গিয়েছিল তারাই হ'ল ছাঁটাই।

এইভাবেই শ্রমিকদের শায়েস্তা করবার চেষ্টা করে ম্যানেজার।

কিন্তু বর্তমান শ্রেণী-সচেতনতার যুগে যে এতটা বাড়াবাড়ি চলে না সে কথাটা হয়তো তার মনে ছিল না। তাই ম্যানেজারের এই স্বেচ্ছাচারিতার ফল হাতে হাতেই ফলে যায়। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা স্থানীয় শ্রমিক-নেতা কল্যাণ গাঙুলীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে।

তাদের মুখ থেকে সব কথা শুনে নিয়ে কল্যাণ গাঙুলী বলে যে, চার পাঁচ জনে প্রতিবাদ জানাতে গেলে কিছুই হবে না। তারা যদি রাজী থাকে তাহলে ইউনিয়ন গড়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারা যায়, আর এই পথেই আসবে সমস্যার সমাধান।

কল্যাণ গাঙুলীর কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায় শ্রমিকরা। ওরা বলে যে, ইউনিয়ন গড়তে সবাই রাজী আছে।

এরপর থেকেই ঘটনার গতি ভিন্নপথে চলতে শুরু করে। মাইনিং কর্পোরেশনের শ্রমিকদের এক সভা আহ্বান করে কল্যাণ গাঙুলী একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলে এবং আইন মাফিক সেই প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রী করে নেয়। ইউনিয়ন রেজিস্ট্রী হয়ে যাবার পর আর একটি সভা আহ্বান করে সে। সেই সভায় স্থির হয় যে, মজুরি বৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ, উন্নত

বাসস্থান, মেয়েদের জন্য মাতৃত্ব-ছুটি প্রভৃতি চৌদ্দদফা দাবি পূরণ করবার জন্য চৌদ্দ দিনের সময় দিয়ে নোটিশ দেওয়া হবে মালিকদের। দাবি পূরণ না করলে, পনের দিনের সকাল থেকে ধর্মঘট করা হবে।

শ্রমিকদের কাছ থেকে চরমপত্র পেয়ে ম্যানেজার একেবারে ক্ষেপে ওঠে। তাদের ডেকে সে রুঢ় ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, ধর্মঘটের হুমকীতে ভয় পাবার লোক সে নয়। শ্রমিকরা যা পাচ্ছে এর চেয়ে এক পয়সাও বেশি পাবে না। এতে যদি অসুবিধে হয় তাহলে তারা কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে।

শ্রমিকরা তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা তখন ম্যানেজারের মুখের ওপরে বলে দেয়—বেশ, তাহলে ধর্মঘটই হবে। দেখি, আমাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে পারি কি না?

ম্যানেজার কিন্তু মোটেই টলে না শ্রমিদের কথায়। সে তখন নতুন শ্রমিক জোগাড় করবার চেষ্টায় থাকে।

ব্যাপার দেখে কল্যাণ আদিবাসীদের মোড়ল সুখন মাঝির সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে এবং তার সাহায্য চায়। সুখন মাঝি তাকে কথা দেয় যে, নতুন শ্রমিক যাতে ম্যানেজার না পায় তার ব্যবস্থা সে করবে।

এইভাবে আটঘাট বেঁধে নিয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাতে থাকে কল্যাণ।

দেখতে দেখতে চৌদ্দ দিন পার হয়ে যায়। পনের দিনের সকাল থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় ধর্মঘট। মাইনিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আড়াইশ' শ্রমিক একযোগে কাজে যাওয়া বন্ধ করে। শুধু তাই নয়, খনিতে ঢুকবার প্রত্যেকটা ফটকের সামনে তারা দল বেঁধে সত্যাগ্রহ শুরু করে দেয়।

ম্যানেজার কিন্তু তখনও নরম হয় না। চতুরানন সিং আর বলদেওদাসের সঙ্গে দেখা করে সে জানায় যে শ্রমিকরা যে রকম মারমুখো হয়ে উঠেছে তাতে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা দরকার।

চতুরানন এবং বলদেওদাস দুজনেই ছিল ম্যানেজারের হাতের পুতুল ; কারণ, ম্যানেজারের সাহায্যেই তারা কাজ গুছিয়ে নেবার ফিকিরে ছিল। সুতরাং ম্যানেজারের প্রস্তাবে সহজেই সম্মতি দেয় তারা।

ম্যানেজার তখন যথারীতি পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং পুলিশও এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই।

এদিকে কল্যাণ যখন দেখতে পায়, ম্যানেজার পুলিশ আমদানি করেছে, তখন সে শ্রমিকদের বলে দেয়. তারা যেন কোন কারণেই মারপিট বা অন্য কোন বে-আইনী কাজ না করে। শ্রমিকদের সে বুঝিয়ে দেয়, মালিকরা এবার চেষ্টা করবে যেমন করে, হোক একটা মারামারি বাধাতে, কারণ. মারামারি বাধলেই শান্তিভঙ্গের অজুহাতে পুলিশ গুলি চালাবার সুযোগ পাবে।

কল্যাণের কথায় শ্রমিকরা আগে থেকেই সাবধান হয়ে যায়। তারা কথা দেয় যে, মারামারি বাধবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তারা দূরে সরে যাবে।

এদিকে পুলিশ এসে পড়ায় ম্যানেজার তার দরোয়ানদের লেলিয়ে দেয় শ্রমিকদের ওপর। দরোয়ানেরা লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালায়।

দরোয়ানদের আক্রমণ চালাতে দেখে কল্যাণ এগিয়ে যায় সেখানে। সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের লক্ষ্য করে সে বলে—ভাইসব! ওরা মারামারি বাধাবার চেষ্টা করছে। তোমরা এবার ধীরে ধীরে এখান থেকে সরে যাও। মার খেয়েও কাউকে তোমরা যেন মারতে যেও না।

কল্যাণের কথা শেষ হবার আগেই একজন দরোয়ান এগিয়ে এসে তার মাথায় লাঠির আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

এই দৃশ্য দেখে শ্রমিকের দল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। তারা বলে, আমাদের নেতার মাথায় যে লাঠি মেরেছে তার রক্ত আমরা দেখতে চাই।

কল্যাণ তখন এক হাতে মাথার সেই ফাটা জায়গাটা চেপে ধরে আর অন্য হাত তুলে শ্রমিকদের শান্ত করতে চেষ্টা করে।

সে বলে, তোমরা উত্তেজিত হ'য়ো না, বন্ধুগণ! আমাকে যে মেরেছে তাকে তোমরা মেরো না।

কল্যাণের কথা শুনে শ্রমিকরা তখন ধীরে ধীরে গেটের সামনে থেকে সরে যায়।

কল্যাণ তখন হাসিমুখে তাদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে—ওদের চাল আমরা ভেস্তে দিয়েছি আজ। এইভাবে চলতে পারলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

মারামারি বাধাবার অপকৌশল এইভাবে ভেস্তে যাওয়ায় ফলে ম্যানেজার একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে তখন দারোগাবাবুর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে বলে—ওরা যদি মারামারি না করে তাহলে কি হবে, দারোগাবাবু?

দারোগাবাবু বলেন—তাহলে আর আমরা কি করতে পারি বলুন? শান্তিভঙ্গ না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না।

—তা তো পারেন না; কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে কল্যাণ গাঙ্গুলী থাকতে তো শান্তিভঙ্গের কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না। ওকে গ্রেপ্তার করা যায় না কোন রকমে?

—না মশাই! এখন আর আমরা ওরকম 'রিস্ক্' নিতে রাজী নই। 'লেবার লিডার'দের গ্রেপ্তার করলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জান যায় পুলিশের। মাঝে মাঝে চাকরীও যায় দু' একজনার।

—তাহলে উপায়?

—উপায় কি আমাকে বলতে হবে? ওদের দু একটা দাবি মেনেই নিন না!

—তা হয়না দারোগাবাবু, ব্যাপারটা এখন প্রেসটিজ-এর প্রশ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি ওদের দাবি মেনে নিই তাহলে

প্রেসটিজ বলতে কিছু আর থাকবে না কোম্পানির। তাছাড়া, একবার প্রেসটিজ নষ্ট হলে, ওরা তখন মাথায় চড়ে বসবে। প্রতি মাসে নতুন নতুন দাবি নিয়ে ধর্মঘট করে বসবে ওরা।

—তাহলে যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমি এখন চলে যাচ্ছি। যদি শান্তিভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখতে পান আবার খবর দেবেন।

—দু চারজন কনষ্টেবলকে রেখে গেলে হতো না, স্যার?

—কি হবে কনষ্টেবল রেখে! ওরা তো মারামারি করবে বলে মনে হচ্ছে না আমার। যাহোক, আপনি যখন বলছেন, তখন দুজন কনষ্টেবলকে রেখে যাচ্ছি এখানে।

এই কথা বলেই দারোগাবাবু চলে যান সেখান থেকে।

দারোগাবাবু চলে গেলে ম্যানেজার উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে থাকে শূন্য আকাশের দিকে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হতাশ হয়ে পড়ে সে।

॥ চৌদ্দ ॥

ধর্মঘটের খবরটা রজতের দাদামশাই হরিশঙ্করবাবুকেও জানানো হয়; কারণ তিনিও কোম্পানির একজন ডিরেক্টার। খবরটা শুনেই তিনি হাজারীবাগে ছুটে আসেন। বলাবাহুল্য, হাজারীবাগ এসে মেয়ের বাড়িতেই তিনি ওঠেন। মেয়ের কাছ থেকেই তিনি জানতে পারেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর কোম্পানি থেকে একটি পয়সাও তিনি পাননি। অফিসে খবর পাঠালে ম্যানেজার নীলরতন সেন একদিন এসে জানিয়ে যায় যে, কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে তিনি শেয়ারের ডিভিডেণ্ড ছাড়া আর কিছু পেতে পারেন না।

হরিশঙ্করবাবু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। লিমিটেড কোম্পানির আইন কানুন তাঁর খুব ভাল করেই জানা আছে। তাঁর তখন মনে হয় যে, তাঁর জামাই এত বোকা ছিল না যে, ভবিষ্যতের কথা ভাববে না।

নিশ্চয়ই তার হাতে এমন শেয়ার আছে যার বলে জেনারেল মিটিং করে পরিচালন ক্ষমতা আজই নিজেদের হাতে আনা যায়। এই কথা মনে হতেই তিনি কোম্পানির অফিসে গিয়ে শেয়ার রেজিষ্টার দেখাতে বলেন ম্যানেজারকে।

ম্যানেজার একটু ইতস্তত করলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, কোম্পানির ডিরেক্টাররূপে আমি শেয়ার রেজিষ্টার দেখতে চাইছি। আপনি দেখাবেন কি না বলুন?

ম্যানেজার তখন বাধ্য হয়ে শেয়ার রেজিষ্টার এনে দেয় তাঁর সামনে।

হরিশঙ্করবাবু তখন তাঁর জামাইয়ের নামে কত শেয়ার আছে তা একখানা কাগজে লিখে নেন। তারপর দেবেনবাবুর স্ত্রীর শেয়ার ও নিজের শেয়ার যোগ করে দেখতে পান যে, কোম্পানির মোট শেয়ারের শতকরা প্রায় পঞ্চান্নভাগ তাঁদেরই হাতে রয়েছে।

বিষয়টা জেনে নেবার পর তিনি ম্যানেজারকে বলেন—দুই তিন দিনের মধ্যেই ডিরেক্টারদের একটা মিটিং-এ ডাকুন ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজার বলে—ডিরেক্টারদের মধ্যে শুধু চতুরাননবাবু আর বলদেওদাসজী এখানে আছেন। আর যাঁরা আছেন, সবাই দূরে থাকেন। বলেন তো ওঁদের দুজনকে আজই খবর দিই।

—না, শুধু ওঁদের দুজনকে খবর দিলেই চলবে না। আমি চাই পরবর্তী মিটিংএ সব ডিরেক্টারই উপস্থিত থাকবেন। আপনি বরং ডিরেক্টারদের ঠিকানাগুলো আমাকে দিন। আমি নিজে চিঠি লিখছি তাঁদের কাছে।

—অতো হাঙ্গামার দরকার কি স্যার? আপনাকে নিয়েই তো কোরাম হয়ে যাবে।

—আমি আপনার কাছ থেকে উপদেশ চাইনি ম্যানেজারবাবু, আমি যা বলছি, তাই করুন। পরবর্তী মিটিং-এ আমি এক্সট্রা অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং-এর দিন ঠিক করবো, বুঝতে পারছেন?

হরিশঙ্করবাবুর কথা শুনে ম্যানেজার রীতিমত ঘাবড়ে যায়। সে বেশ বুঝতে পারে যে, বুড়ো সহজ লোক নন। এক্সট্রা অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং ডেকে তিনি হয়তো দেবেনবাবুর ছেলেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত করবেন। সে এ কথা ভাল করেই জানে যে দেবেন-বাবু, তাঁর স্ত্রী আর এই বুড়োর হাতে যে শেয়ার আছে তার বলে অতি সহজেই কোম্পানির পরিচালন ক্ষমতা হস্তগত করতে পারেন ইনি।

কিন্তু বুঝলেও হরিশঙ্কর বাবুকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার নেই। সে তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই ডিরেক্টরদের ঠিকানাগুলো একখানা কাগজে লিখে তাঁর কাছে দেয়।

ঠিকানাগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে হরিশঙ্করবাবু বলেন—সে কি ম্যানেজারবাবু! এই না আপনি বললেন, এখানে শুধু দুজন ছাড়া আর কোন ডিরেক্টর নেই! এই তো দেখছি আরও তিনজন ডিরেক্টর এখানেই থাকেন। রায়বাহাদুর মতিলাল ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যার কুমুদবন্ধু চ্যাটার্জী আর ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মিত্র তো এখানকারই লোক দেখছি!

হরিশঙ্করবাবুর কথায় আমতা আমতা করে ম্যানেজার বলে—হ্যাঁ, স্যার, ওঁরা এখানেই থাকেন বটে, তবে ওঁরা কখনও মিটিংএ আসেন না।

—তাই কি? না, আসার জন্য ওদের বলা হয় না? কই ডিরেক্টার মাইনিউট বইখানা দেখি! দেবেন মারা পর কটা মিটিং হয়েছে আমি দেখতে চাই।

ম্যানেজার তখন মুখ কাচুমাচু করে 'ডিরেক্টার্স মাইনিউট' বইখানা এনে দেয়।

হরিশঙ্করবাবু মাইনিউট বইখানা পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর একটিমাত্র রিজলিউশন রয়েছে বইতে। রিজলিউশনের প্রথমেই রয়েছে একটি শোক প্রস্তাব। প্রস্তাবটি এইরূপ :—"কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।"

শোক প্রস্তাবের পরই প্রধান প্রস্তাবটি লেখা হয়েছে। তাতে আছে—"নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির যাবতীয় পরিচালনভার ডিরেক্টারবোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে কোম্পানির ম্যানেজার নিলরতন সেনকে দেওয়া হইল। অতঃপর শ্রীসেন ম্যানেজাররূপে কোম্পানির যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিবেন এবং যাবতীর নিয়োগ, বরখাস্ত, টাকাপয়সার আদানপ্রদান ইত্যাদি করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কের চেকেও তিনি সই করিতে পারিবেন।

অবশ্য তিনি তার যাবতীয় কার্যের জন্য ডিরেক্টার বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং সাধারণ রুটিন মাফিক কার্য ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কার্য ডিরেক্টারদের দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদন করিয়া লইবেন।

এই প্রস্তাবের একটি নকল কোম্পানির ব্যাঙ্কারের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

রিজলিউশনটা দেখা হয়ে গেলে হরিশঙ্করবাবু ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললেন—এরপর আর কোন মিটিং ডাকা হয়নি কেন ?

- মিটিং ডাকবার মত তেমন কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়নি বলেই ডাকা হয়নি।

— বেশ, এবার তাহলে ডাকা হোক।

—কবে ডাকতে চান মিটিং ?

— সাতদিন পরে। আপনি আজই নোটিশ পাঠিয়ে দিন প্রত্যেক ডিরেক্টারের নামে। যাঁরা এখানে উপস্থিত নেই তাদের নামে রেজিষ্ট্রি ডাকে নোটিশ পাঠান। আজ থেকে আট দিন পরে মিটিং হবে বলে নোটিশ দিন। রেজিষ্ট্রি রসিদগুলো আমি কাল এসে যেন দেখতে পাই।

এই কথা বলেই হরিশঙ্করবাবু উঠে পড়েন সেখান থেকে।

নির্দিষ্ট দিনে ডিরেক্টারদের মিটিং বসে কোম্পানির অফিসে

একজন ছাড়া আর সব ডিরেক্টারই উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন।

হরিশঙ্করবাবুর প্রস্তাবে এবং রায়বাহাদুরের সমর্থনে স্যার কুমুদ চ্যাটার্জী সভাপতির আসনে উপবেশন করেন।

চেয়ারম্যান ঠিক হয়ে যাবার পর হরিশঙ্করবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করেন—"মাননীয় চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ! আমি আজ এমন কতকগুলো বিষয় আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি যেগুলোর সঙ্গে এই কোম্পানির সুনাম ও স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত।

কোম্পানির খনিতে আজ যে ব্যাপক ধর্মঘট চলছে এবং যে ধর্ম-ঘটের ফলে দৈনিক পাঁচ হাজার টাকারও বেশি লোকসান হচ্ছে, তার উৎপত্তি সম্বন্ধেও আপনাদের আমি অবহিত করতে চাই।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন আমার জামাতা। নিজের আজীবন সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি গত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত অশোভনভাবে সাত তাড়াতাড়ি একটা ডিরেক্টার্স মিটিং করে কোম্পানির লাখ লাখ টাকার ওপরে কর্তৃত্ব একজন বেতনভুক কর্মচারির হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঐ মিটিং কবে ডাকা হয়েছিল তার কোন প্রমাণও অফিসে দেখা যাচ্ছে না। আমিও কোম্পানির একজন ডিরেক্টার, কিন্তু আমার কাছে ঐ মিটিংয়ের কোন নোটিশ যায় নাই।

মাইনিউট বইতে দেখতে পাচ্ছি, সেই মিটিংএ মাত্র তিনজন ডিরেক্টার উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন, শ্রীচতুরানন সিং, শ্রীবলদেওদাস শেঠিয়া এবং রায়বাহাদুর মতিলাল চৌধুরী।

এই সময় রায়বাহাদুর হঠাৎ বলে ওঠেন—সে কি রায় মশাই! আমি ও রকম কোন মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম বলে তো মনে পড়ে না।

রায়বাহাদুরের কথায় মৃদু হেসে হরিশঙ্করবাবু বললেন—তা হতে পারে না। রিজলিউশনে আপনার সই অবশ্য নেই, কিন্তু চেয়ারম্যান-

রূপে চতুরাননবাবু সই করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, আপনি উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না ছিলেন সে নিয়ে পরে বুঝাপড়া করা যাবে, এখন আমার কথাগুলো দয়া করে শুনুন।

আমি শেয়ার রেজিষ্টার পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছি যে, দেবেন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ আমাদের সুযোগ্য ম্যানেজার মশাইর পদোন্নতির পর প্রায় দু'শ নতুন শেয়ার বিক্রি করা হয়েছে। আরও আশ্চর্য যে, এইসব শেয়ার-হোল্ডার সবাই অবাঙালী। আমি এখানে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তুলছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, এইসব শেয়ার-হোল্ডারদের পাকাপাকিভাবে রেজিষ্টাভুক্ত করে নিতে পারলে অতি সহজেই দেবেন্দ্রনাথের ছেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবার পথ বন্ধ করা যায়। কাজটা অবশ্য এখনও পাকাপাকিভাবে করা সম্ভব হয়নি, কারণ এলটমেন্ট না করলে এবং এলটমেণ্টের টাকা জমা না দিলে এরা শেয়ার-হোল্ডাররূপে গণ্য হতে পারে না।

আমার মনে হয়, এলটমেন্ট-ও এতদিনে হয়ে যেতো, কিন্তু হঠাৎ ধর্মঘট আরম্ভ হওয়াতেই ও কাজটা বন্ধ রয়েছে।

এই সময় চেয়ারম্যান বললেন—ডিরেক্টার মিটিং না করে এলট-মেণ্ট কি ভাবে হ'তো ?

হরিশঙ্করবাবু হেসে বললেন— যেভাবে আগের মিটিংএ কোম্পানির পরিচালনভার ম্যানেজারকে দেওয়া হয়েছে, সেইভাবেই ওটাও হতো বলে মনে হয়।

হরিশঙ্করবাবুর এই কথায় চতুরানন সিং বলেন—রায় মশাই কি আমার ওপর কোনরকম সন্দেহ করছেন ?

হরিশঙ্কর বলেন—না না, আপনার ওপরে সন্দেহ করব কেন ? শুধু খাতাপত্র দেখে যা আমার মনে হয়েছে সেই কথাগুলোই বলছি।

এই বলে চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলেন— আমার মনে হচ্ছে কোম্পানির হিসেবের খাতাও গড়মিল করা হয়েছে

এই কয় মাসে। যাহোক, হিসেবের কথা এখন না তুলে আমি একটা গুরুতর কথা আপনাদের শুনাচ্ছি। আপনারা হয়তো জানেন না যে, খনিতে যে ধর্মঘট চলছে তার মূলে আছে একটি বলাৎকারের ঘটনা। রঙিয়া নামে এক যুবতী কামিনকে কোয়ার্টারে ডেকে এনে আমাদের ধুরন্ধর ম্যানেজার মশাই তার ওপর বলাৎকার করেন। রঙিয়া ফিরে গিয়ে পুরুষ শ্রমিদের কাছে তার লাঞ্ছনার কথা বলে প্রতিকার প্রার্থনা করে। তারা তখন দলবদ্ধ হয়ে ম্যানেজারের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে আসে। ম্যানেজার কিন্তু কৈফিয়ৎ দেন গুলি চালিয়ে। ফলে একজন শ্রমিক মারা যায়। এরপর ওদের মধ্যে সর্দার গোছের লোকদের ছাঁটাই করা হয়। সেই ছাঁটাই করা শ্রমিকদের চেষ্টাতেই আজকের এই ধর্মঘট।

হরিশঙ্করবাবুর কথা শুনে স্যার কুমুদ চাটার্জী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন—বলেন কি রায় মশাই! এ যে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার!

—নিশ্চয়ই সাংঘাতিক, স্যার চ্যাটার্জী। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাংঘাতিক কাজটা যে করেছে, আমরাই তাকে ক্ষমতার উচ্চাসনে বসিয়েছি।

এই সময় শেঠিয়াজী বলে ওঠেন—আপনার এসব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন কি?

হরিশঙ্করবাবু হেসে বলেন—এটা বিচারালয় নয়, শেঠিয়াজী।

চতুরানন বলেন—বিচারালয় না হলেও, কোম্পানির ম্যানেজারের ওপর এরকম একট সিরিয়াস অভিযোগ আনা হলে কিছু প্রমাণ চাই বই কি।

—তা যদি চান তাহলে বরং ধর্মঘটি শ্রমিকদের সঙ্গে একবার দেখা করুন। সেই লাঞ্ছিতা মেয়েটিও বেঁচেই আছে। তার কাছেও জিজ্ঞেস করতে পারেন।

—ওদের কথাই কি সত্যি বলে মেনে নিতে হবে আমাদের?

—মানা না মানা আপনার ইচ্ছা। যাহোক, দয়া করে আমার

কথাগুলো শেষ করতে দিন। আমার ইচ্ছা, আজ থেকে একুশ দিন পরে, অর্থাৎ তেরই ফাল্গুন তারিখে শেয়ার হোল্ডারদের একটা এক্সট্রা অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হোক এবং সেই মিটিং-এর 'এজেণ্ডা' স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রজত চৌধুরীকে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে নিযুক্ত করবার কথা উল্লেখ করা হোক।

এবারে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, আমার এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হবে, না বাতিল করা হবে?

এই বলে একটু চুপ করে থেকে হরিশঙ্করবাবু আবার বলেন—হ্যাঁ, আরও একটি কথা শুনে রাখুন। আমার প্রস্তাব বাতিল করা হলেও একষ্ট্রা-অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং হবেই। সোজা পথে না হলে রিকুইজিশন-এর পথে যেতে বাধ্য হব আমি।

হরিশঙ্করবাবু বসলে ডিরেক্টারদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হয়। রায়বাহাদুর বলেন তিনি এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন। ডাঃ মিত্রও সমর্থন করতে চান এ প্রস্তাবটা। কোম্পানির আর একজন ডিরেক্টার শ্রী দেওজিনন্দন সহায় প্রস্তাবটা সমর্থন করবেন বলেন

চেয়ারম্যান তখন ডিরেক্টারদের দিকে তাকিয়ে বলেন—আপনাদের কারও কোন আপত্তি আছে কি এ প্রস্তাবে?

রায়বাহাদুর ডাঃ মিত্র আর যদুনন্দন সহায় একবাক্যে বলে উঠলেন—না। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

চেয়ারম্যান তখন চতুরানন সিং আর বলদেওদাস শেঠিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন কই, আপনারা তো কিছু বললেন না?

চতুরানন বললেন—আমারও কোন আপত্তি নেই।

শেঠীয়াজীও বাধ্য হয়েই সমর্থন জানালেন।

চেয়ারম্যান তখন মাইনিউট বই টেনে নিয়ে যথারীতি রিজলিউশন লিখে ডিরেক্টারদের সই নিলেন। বলাবাহুল্য নিজেও চেয়ারম্যানরূপে সই করলেন।

এই মিটিং-এর পরদিন সকালেই হরিশঙ্করবাবুর কাছে খবর এলো যে, ম্যানেজারবাবুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। খবরটা নিয়ে এসেছিল কোম্পানির একাউন্টেন্ট নিলমণি সামন্ত।

হরিশঙ্করবাবু মৃদু হেসে বললেন -তা আমি জানি, সামন্তমশাই। শুধু ম্যানেজারবাবু কেন, আর একজন কর্মচারিও বোধহয় শীগ্‌গিরই গা-ঢাকা দিবেন।

এই বলে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে নিলমণির দিকে তাকালেন তিনি।

হরিশঙ্করবাবুর কথাই সত্যি হ'ল। পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, আর একজন কর্মচারিও সপরিবারে উধাও হয়েছে। কর্মচারিটির নাম নিলমণি সামন্ত।

পনের

রজতের দাদামশাই অর্থাৎ হরিশঙ্কর রায় যখন রজতের ভবিষ্যত জীবনের পথ থেকে কাঁটা সাফ্ করতে ব্যস্ত সেই সময় একদিন রজত এসে হাজির হ'ল তার ভবিষ্যত জীবনের সঙ্গিনীকে সঙ্গে করে।

ছেলের সঙ্গে একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী, একটি কিশোর আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে অমলাদেবী বেশ কিছুটা অবাক হন। তাই রজত বাড়ির ভিতরে এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন—ওঁরা কে বাবা?

রজত হেসে বলে—ওঁদের পরিচয় একটু পরেই দিচ্ছি, মা, আগে তুমি এই টাকাগুলো তুলে রাখো।

এই বলে ব্যাগ থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে দিয়ে রজত আবার বলে—মেয়েটিকে তোমার কাছে ডেকে নাও, মা।

ছেলের কথা থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও একটা বিষয় তিনি বুঝে নিলেন যে, মেয়েটিকে রজত আশ্রয় দিতে চায়।

তিনি তাই রজতকে বলেন—আমি ডেকে নেব কেন, তুই ওকে নিয়ে আসতে পারিস না আমার কাছে ?

রজত হেসে বলে—তোমার হুকুম পেলে নিশ্চয়ই পারি, মা।

এই বলে বাইরে গিয়ে কল্যাণীকে সঙ্গে করে মায়ের কাছে নিয়ে এসে বলে—মাকে প্রণাম কর, কল্যাণী !

কল্যাণী অমলাদেবীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। অমলাদেবী আশীর্বাদ করেন—চিরায়ুস্মতী হও, মা !

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রজত বুঝতে পারে যে, কল্যাণীকে তিনি খুশি মনেই গ্রহণ করেছেন।

সে তখন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে—আমি তাহলে ওদের ব্যবস্থা করে আসি, মা ?

এই কথা বলেই ভিতর মহল থেকে বেরিয়ে যায় রজত।

রজত চলে যেতেই অমলাদেবী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন—তোমার নাম কি, মা ?

—কুমারী কল্যাণী দাস।

—যাঁরা তোমার সঙ্গে এসেছেন তাঁরা কে হন তোমার ?

—আমার বাবা আর ছোটভাই।

—তোমাদের বাড়ি কি রায়পুরে ?

—হুঁ।

এই সময় বছর সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলে—মাইজী, হামরা চা ?

হঠাৎ কল্যাণীর দিকে নজর পড়ায় লজ্জিত হয়ে মেয়েটি আবার বলে—এঁকে তো চিনতে পারছি না, মা ?

—ওর নাম কল্যাণী। ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। চা আর খাবার ওখানেই পাঠাচ্ছি।

—ছাটস্ লাইক্ এ গুড্ গার্ল, ম্যামি! এই জন্যই তো তোমাকে এত ভালবাসি।

এই বলে কল্যাণীর হাত ধরে এক টান মেরে সে বলে—আইয়ে মিস্ কল্যাণী!

প্রথম দর্শনেই কল্যাণীর ভাল লাগে মেয়েটিকে। সে তাই অতি সহজেই ধরা দেয় তার কাছে। বহুদিনের চেনা বন্ধুর মত হাত ধরাধরি করে চলে যায় ওরা।

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি কল্যাণীর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে—আপ কাঁহাকো রহ্নেবালী কহিয়ে তো?

কল্যাণী ফিক্ করে হেসে বলে—বাংলায় বলুন না!

—বাংলা! আপনি তাহলে বংগালী আছেন? ভেরী ব্যাড্!

—ভেরী ব্যাড্ মানে? বাঙালী হওয়াটা কি দোষের?

—দোষের! হু সেজ্ ছাট? কৌন বোলা ই বাত? কে বলেছে সে কথা?

কল্যাণী হেসে বলে—'কোঁড় কহুচি' দেশের ভাষা বুঝি জানা নেই?

কল্যাণীর কথা শুনে মেয়েটি দু' হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—তোমাকে ভাই প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছি আমি।

কল্যাণী বলে—আমার অবস্থাও তাই, উর্মি!

—আমার নাম ধীরা।

—সেকি! আমি তো ভেবেছিলাম তুমিই উর্মি।

—উর্মির নাম তুমি কি করে জানলে?

—তার দাদার কাছ থেকে।

—তার দাদা তোমার কে হন ভাই?

মেয়েটির এই প্রশ্নে লজ্জায় মুখ নিচু করে কল্যাণী। বলে—কিছু হন না, তবে চেনাশুনা আছে আমাদের।

—এতো ভাল কথা নয় ভাই। তোমার মত বয়েসের মেয়ের সঙ্গে উর্মির দাদার চেনাশুনা হওয়াটা কেমন গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে যে!

এই সময় হু' হাতে হু' ডিস খাবার নিয়ে অমলাদেবী সেই ঘরে প্রবেশ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—কি রে উর্মী! এখনও ওকে আটকে রেখেছিস? ওর যে এখনও হাত মুখ ধোওয়া হয়নি।

উর্মি লজ্জিত হয়ে বলে—এসো ভাই, বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বাথরুম কি বস্তু কল্যাণী তা বুঝতে পারে না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করে সে উর্মির সঙ্গে যেতে থাকে।

যেতে যেতে সে বলে—কি গো উর্মি, নাম ভাঁড়িয়েছিলে যে বড়?

উর্মি ভাঙে তবু মচকায় না। সে বলে—নাম ভাঁড়াবো কেন, উর্মি আর ধীরা হুই নামই আমার আছে।

—তা না হয় আছে, কিন্তু তুমি অন্য বাড়ির মেয়ে বললে কেন?

—কই সে রকম কথা তো আমি বলিনি!

—বলোনি মানে! এই তো কিছুক্ষণ আগেই বললে, তোমার নাম ধীরা।

—তা বলেছি। কিন্তু আমি অন্য বাড়ির মেয়ে সে কথা তো বলিনি।

তর্কে হেরে কল্যাণী বলে—ঘাট মানছি ভাই। তোমার মত লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গে কি কথায় জিততে পারি আমি!

লেখাপড়া জানা না ছাই। ম্যাট্রিক পাশকে আবার কেউ লেখাপড়া জানা বলে নাকি?

কথা বলতে বলতে বাথরুমের সামনে এসে পড়ে ওরা। এই সময় উর্মির হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে, কল্যাণীকে কাপড় জামা দেওয়া হয়নি।

সে তাই লজ্জিত হয়ে বলে—এই দ্যাখো! কথায় কথায় তোমাকে কাপড় জামা দেবার কথাটাই ভুলে গেছি যে! তুমি ভাই বাথরুমে ঢুকে চান করতে আরম্ভ কর, আমি জামা কাপড় নিয়ে আসছি।

এই বলে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিয়ে চলে যায় উর্মি।

বাথরুমের ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে যায় কল্যাণী। দেয়ালে ঝুলানো আয়না। তার নিচে একটি সেল্‌ফের ওপর চিরুনি, ব্রাস, তেল, সাবান, স্নো, পাউডার এবং আরও কত কি সাজানো রয়েছে।

মার্বেলের চৌবাচ্চায় জল ভরতি।

বিলাস-উপকরণের এই রকম প্রাচুর্য দেখে ঘাবড়ে যায় কল্যাণী। মনে মনে খুশিও হয় সে। খুশি হয় এই ভেবে যে, রজতের সঙ্গে বিয়ে হলে একদিন সেই হবে এ বাড়ির কর্ত্রী।

সে তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে মনের আনন্দে স্নান করতে আরম্ভ করে।

স্নান করতে করতে হঠাৎ তার নজর পড়ে আয়নাটার দিকে। আয়নার বুকে ফুটে উঠেছে তার স্নানরতা দেহের প্রতিকৃতি।

এই প্রথম কল্যাণী নিজেকে দেখলো। তার মনে হ'ল "আমি এত সুন্দর!"

এরপর তার ইচ্ছা হ'ল আরও ভাল করে নিজেকে দেখতে। নিজের দেহের নগ্ন সৌন্দর্যকে নিজের চোখে দেখতে। কেউ তো কোথাও নেই, দরজাটাও বন্ধ, লজ্জা কি তাহলে?

কিন্তু পরক্ষণেই রাজ্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরে তাকে। কেউ দেখতে পাবে না বুঝলেও কেন যেন কাপড় ছাড়তে পারে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। আয়নাটা ঠিক তার সামনে। ভিজে কাপড় জামা দেহের সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সৌন্দর্যের প্রতীক পিনোন্নত পয়োধর যুগল।

আর সে পারে না নিজেকে সামলে রাখতে—নিজের চোখের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। বসনের কারাগার থেকে নিজেকে সে মুক্ত করে দেয়।

কিছুদিন আগে একখানা পত্রিকায় সে একটা কবিতা পড়েছিল।

কবিতাটায় নাম বা কার লেখা সে কথা তার মনে নেই মনে আছে কবিতার কয়েকটি লাইন—

> "প্রদীপের শিখালুব্ধ পতঙ্গের মত দলে দলে
> ওরা আসি মূর্ছা যাবে তব দীপ্ত রূপের অনলে।
> তবে কেন ওগো নারি! বসনের নাগপাশ দিয়া
> পুষ্পিত তনুরে তব আজও বৃথা রেখেছ ঢাকিয়া!"

কবিতাটা পড়ে সেদিন লজ্জা হয়েছিল কল্যাণীর। রাগ হয়েছিল কবির ওপরে। মনে মনে বলেছিল—ছিঃ! এমন কবিতা আবার কেউ লেখে নাকি?

আজ কিন্তু তার মনে হ'ল কবি ঠিকই লিখেছিলেন।

ঠিক এই সময় দরজার বাইরে করাঘাতের শব্দ শোনা যায়। কল্যাণী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় তুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে বলে—কে, উর্মি নাকি?

বাইরে থেকে উর্মির কণ্ঠ শোনা যায়—তোমার জামা কাপড় এনেছি, নাও।

কল্যাণী দরজা খুলে উর্মির হাত থেকে জামা কাপড় নিয়ে আবার বন্ধ করে দেয় দরজা।

মিনিট দুই পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে কল্যাণী। উর্মির জামা কাপড়ে চমৎকার মানায় তাকে।

উর্মি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। কল্যাণী তাকে জিজ্ঞেস করে—জামা কাপড়গুলো কোথায় শুকোতে দেব ভাই?

উর্মি বলে—সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। কাপড় জামা শুকোতে দেবার জন্য লোক আছে। তুমি এসো, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ওদিকে।

ভিতর মহলে উর্মি যখন কল্যাণীকে নিয়ে খেতে খেতে গল্প করছে, বাইরের মহলে তখন হরিশঙ্কর বাবুর কাছে কল্যাণীর কথাই বলছে

রজত। দাদুকে সে একেবারে 'মাই ডিয়ার' মনে করে। তাই কোন কিছু গোপন না করে সবই সে বলছিল তাঁর কাছে।

তার বাবার মৃত্যু—রায়পুর যাওয়া—ক্লাব ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা—গ্রামের বালকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—কল্যাণীর বাবার গ্রেপ্তার—রাত্রে কল্যাণীকে অপহরণের চেষ্টা—ডাকাতদের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ—মামলার অবস্থা ইত্যাদি সব কিছু বিবৃত করবার পর রজত জিজ্ঞেস করে—এ অবস্থায় কল্যাণীকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়ে কি অন্যায় করেছি দাদু ?

হরিশঙ্করবাবু হেসে বলেন—এখন আর ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন তুলে লাভ কি ভাই ? ভাবী বধূকে যখন একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছ, তখন যত শীগ্‌গির শুভ কাজটা শেষ করে ফেলা যায় ততই মঙ্গল।

রজত বলে—শুভ কাজের দিনক্ষণ ঠিক করেই এসেছি দাদু। আগামী বারই ফাল্গুন আমাদের বিয়ে।

—কি বললে ! বারই ফাল্গুন ? তাহলে তো দেখছি তোমার স্ত্রীভাগ্য খুবই উজ্জ্বল।

—তার মানে ?

—মানে, বিয়ের পরদিন থেকেই তুমি মাইনিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত হচ্ছো !

—বলেন কি দাদু ! এ আবার কোন্ আলাদিন এসে তার আশ্চর্য প্রদীপ জ্বাললো ?

আলাদিন তোমার সামনেই বসে আছে ভাই ; কিন্তু প্রদীপটা জ্বেলেছে বোধহয় কল্যাণী।

—কি ব্যাপার হয়েছে খুলেই বলুন না, দাদু !

—সেই কথা বলতেই তোমাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু তার আগে তুমি যা শুনালে সে তো দেখছি রীতিমত এক নভেল। কাহিনীটা লিখে ফেললে চমৎকার উপন্যাস হয় একখানা।

—আচ্ছা, উপন্যাস না হয় লিখলাম, আপনি এদিকের ব্যাপারটা বলুন তো !

হরিশঙ্করবাবু তখন মাইনিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আদি পর্ব থেকে শুরু করে খনি মজুরদের ধর্মঘট পর্যন্ত সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত করে অবশেষে বলেন—তেরই ফাল্গুন এক্সস্ট্রা। অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে; আশাকরি ঐ মিটিংয়েই তোমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করতে পারবো!

রজত হেসে বলে—সেইজন্যই বুঝি বলছিলেন আমার স্ত্রীভাগ্য উজ্জ্বল? কিন্তু আমি তো দেখছি অন্যরকম।

—কি রকম?

—আমি দেখছি, স্ত্রীভাগ্যের চাইতে আমার দাতৃভাগ্য বেশি উজ্জ্বল।

রজতের কথা শুনে হরিশঙ্কর রায় একেবারে হো-হো করে হেসে উঠেন।

॥ ষোল ॥

বিয়ের দিন। বেলা তখন প্রায় ন'টা। কিন্তু ইতিমধ্যেই সারা বাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে। সদর ফটকের পাশে রসৌন চৌকি পার্টিকে বসতে দেওয়া হয়েছে। সানাই আর টিকারা সহযোগে নানারকম রাগ-রাগিণীর আলাপ করছে তারা।

ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীরা বাড়িখানাকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলবার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করছে।

ভিতরের উঠানে ভিয়ান বসিয়ে রসগোল্লা, পান্তুয়া, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। হরিশঙ্করবাবুর ম্যানেজার কলকাতা থেকে একগাদা শাড়ি আর তিন সেট গয়না নিয়ে এসে অমলাদেবীকে দেখাচ্ছেন।

এদিকে হরিশঙ্করবাবুও চড়কির মত ঘুরে ঘুরে সবকিছু তদারক করছেন আর মাঝে মাঝে তামাক খাচ্ছেন। অজিত নতুন জামা-কাপড়

পরে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বেড়াচ্ছে আর দেবেনবাবু মাঝে মাঝে চা খাচ্ছেন আর এর-ওর-তার সঙ্গে গল্পগুজব করছেন।

বলতে ভুলে গেছি, অমলাদেবীর আদেশে গৌরীদেবীকেও নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি এসেই স্বেচ্ছায় রসুই বিভাগের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। পাকা রাঁধুনি বলে গ্রামে তাঁর নাম ছিল, আজ নিজের মেয়ের বিয়েতে তিনি তার পরীক্ষা দেবেন বলে মনে মনে স্থির করেছেন। মোট কথা, সারা বাড়ি জুড়ে এক এলাহি ব্যাপার চলছে।

কিন্তু এই এলাহি ব্যাপার যাদের নিয়ে, অর্থাৎ রজত আর কল্যাণী—তাদেরই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

রজত গেছে ধর্মঘটি শ্রমিকদের কাছে। শ্রমিকদের সবাইকে সে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করবে, এই তার ইচ্ছা।

ওদিকে কল্যাণী আটকা পড়েছে ঊর্মির ঘরে। ঊর্মি তাকে নিজের হাতে সাজাচ্ছে।

বেলা তখন প্রায় তিনটে।

কল্যাণীকে মনের মত করে সাজিয়ে তার চিবুক ধরে আদর করে ঊর্মি বলে—মেরে খুবসুরত ভাবী!

কল্যাণী হেসে বলে—সে আবার কি?

—এর অর্থ, আমার সুন্দর বৌদি, বুঝলে?

—এবার বুঝলাম বইকি, কিন্তু তোমার ঐ হিন্দী বাত্‌চিত্‌ ভাই আমি বুঝতে পারি নে।

—পারবে গো, পারবে। বিহারের মাটিতে যখন একবার পা দিয়েছ, তখন সুড়সুড় করে হিন্দী বের হবে মুখ দিয়ে। তাছাড়া, যে লোকের পাল্লায় পড়েছ, তাতে হিন্দীতে বক্তৃতাও দিতে হবে তোমার।

—বক্তৃতা দিতে হবে! কোথায়?

—মিটিং-এ। দাদা যে একজন হবু শ্রমিক নেতা! নেতাদের বক্তৃতা শুনেছ তো? সেই যে, "ভাইয়োঁ! ঔর বহিনো!"

—না ভাই, ও সব আমার দ্বারা হবে না।

—হবে না মানে? আল্‌বাৎ হবে। হতেই হবে। দেখতে পাবে, আজ রাত থেকেই দাদা তোমাকে বক্তৃতার রিহার্সাল দেওয়াতে শুরু করবে। দাদা এখন কোথায় গেছে জানো?

—কোথায়?

—খনির শ্রমিকদের কাছে। হয়তো এখন সে বক্তৃতা দিচ্ছে তাদের কাছে।

উর্মির কথাই ঠিক। সত্যিই রজত তখন বক্তৃতা করছিল শ্রমিকদের কাছে। প্রথমে সে এসেছিল ওদের নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু ওদের কাছে নিজের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা তাকে ঘিরে ধরে নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে শুরু করে। ধর্মঘটের ইতিহাসও বর্ণনা করে ওরা।

সব শুনে রজত আর চুপ করে থাকতে পারে না। রাগে, দুঃখে আর লজ্জায় সে শ্রমিকদের কাছে হাতজোড় করে বলে—তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

রঙিয়া এগিয়ে এসে বলে—তু মাপি মাংছিস্ কেনে বাবু! তু তো কোন দোষ করিস নাই। বদমায়েস আছে তুদের ম্যানেজার।

—ম্যানেজার আর নেই বহিন। বিপদ দেখে সে পালিয়েছে।

—কি বললি বাবু! পলাইছে! বদমাইস আদমিটা পলাইছে!

—হ্যাঁ বহিন, সে পালিয়েছে। কাল থেকে কোম্পানির ভার আমি নিচ্ছি।

—তু লিছিস্! তবে তো খুব ভাল হবে বাবু।

—তা তো হবে. কিন্তু আমার বিয়েতে যাবে তো তোমরা?

—নিশ্চয় যাবো। যাবো, নাচবো, গাইব, তুর বহু দেখব। বহু দেখাবি তো বাবু?

—কেন দেখাব না বহিন। বউ কি লুকিয়ে রাখবার জিনিস?

—আচ্ছা বাবু! তু তো মালিক হবি। হামাদের ধর্মঘটের কি করবি!

—কি আবার করবো? তোমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেব।

—মাইনে বাড়িয়ে দিবি তো বাবু!

—হ্যাঁ বহিন, মাইনে বাড়িয়ে দেব। শুধু তাই নয়, তোমাদের থাকবার জন্য ভাল ঘর, বছরে পনের দিন ছুটি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা আর মেয়েদের সন্তান হবার সময় পুরা মাইনের দুই মাসের ছুটির ব্যবস্থা করব।

রজতের কথা শুনে শ্রমিকরা অবাক হয়ে যায়। তারা ভাবে, বাবুটা বলছে কি? এত সুবিধা কি কেউ দেয় নাকি?

একজন মুখ ফুটে বলেই ফেলে—হামাদের কাজে লাগাবার জন্যে ই কথা বলছিস না তো বাবু?

রজত বলে—না ভাই, সে রকম কোন বদ মতলব আমার নেই। আমি জানি, আমরা যেমন টাকা খাটিয়ে খনি চালাচ্ছি, তোমরাও তেমনি গতর খাটিয়ে খনি চালাচ্ছো।

রজতের কথায় শ্রমিকদের ভিতরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। চাঞ্চল্য আরও বেড়ে ওঠে কল্যাণ গাঙ্গুলীর আগমনে। সেও হঠাৎ এসে পড়ে ওখানে।

তাকে দেখেই শ্রমিকদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—এ নেতা বাবু! আমাদের ছোট মালিক কি বুলছেন শুন্।

কল্যাণ রজতকে চেনে না। সে তাই রজতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—আপনি কি এ:দের ভাংচি দিতে এসেছেন নাকি?

কল্যাণের কথায় রজত হেসে বলে—আপনিই বুঝি শ্রমিকনেতা কল্যাণ গাঙ্গুলী?

গম্ভীর কণ্ঠে কল্যাণ বলে—হ্যাঁ।

রজত বলে—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম কল্যাণবাবু।

আপনি হয়তো জানেন না যে, কাল থেকে মাইনিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর পরিচালনা ভার আমার ওপর আসছে।

—ও, আপনিই তাহলে রজতবাবু! ফাউণ্ডারের ছেলে আপনি? নমস্কার!

—সৌজন্য জানাবার দরকার নেই, কল্যাণবাবু। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করতে পেরেছেন বলে। শুধু তাই নয়; এদের প্রতি যে অন্যায় আর অবিচার চলছিল, তার বিরুদ্ধে আপনি যে ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, সেজন্যও আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। যাই হোক, এবার আমার কথাগুলো একবার শুনবেন কি?

—নিশ্চয় শুনবো, বলুন!

—আমার ইচ্ছা, হাতে ক্ষমতা আসব[illegible] এদের মাইনে বাড়িয়ে দেব। আমি বিশ্বাস ক[illegible]মরা যেমন টাকা দিয়ে খনি চালাই, শ্রমিকরাও তেমনি গতর খাটিয়ে সেগুলো চালায়। তাই আমাদের মত ওদেরও অধিকার আছে এই খনির ওপর। তবে আমাদের মত লোকেরা অর্থাৎ মালিক শ্রেণী শ্রমিকদের এই অধিকারের কথা স্বীকার করতে চায় না। তারা এদের হাজারো রকম অভাব-অভিযোগের মধ্যে রেখে টাকার জোরে এদের মেহনত কিনে লাভের অঙ্ক বাড়াতে চায়। অবশ্য, আপনাকে আর এ সব কথা নতুন করে কি বলব। মালিক শ্রেণীর মনের কথা আপনি ভাল করেই জানেন। আমি তাই আমার কথাটাই শুধু বলতে চাই। আমি মনে করেছি, খনির লাভের অংশ থেকে এদের আমি বঞ্চিত করব না।

সবার আগে আমি এদের মাইনে বাড়াবো। তারপর তৈরি করবো এদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ। ক্রমে হাসপাতাল, প্রসূতি আগার, স্কুল, খেলার মাঠ ইত্যাদিও স্থাপন করবার ইচ্ছা আছে আমার। এসব করবার পরেও যদি টাকা থাকে, সেই টাকা অংশীদার আর শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। অংশীদাররা যেমন ডিভিডেণ্ড

পাবে, শ্রমিকরাও তেমনি পাবে বোনাস। মোট কথা, এরা যাতে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার পায় সে ব্যবস্থা আমি করবো।

রজতের কথা শুনে কল্যাণ গাঙ্গুলী তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে—রজত বাবু! এযে আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি এত মহান!

রজতও কল্যাণকে জড়িয়ে ধরে বলে—মহান আমি মোটেই নই বন্ধু! এতদিন পড়াশুনা ক'রে আমি যা কর্তব্য বলে বুঝেছি, ক্ষমতা হাতে পেলে সেই কর্তব্যই পালন করতে চেষ্টা করব মাত্র। তবে আমার ইচ্ছা, আমার এই কাজে আপনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি, কল্যাণবাবু।

—আপনার মত বন্ধু পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব, রজতবাবু। আপনার পাশে আমি সব সময় আছি।

এই বলে সে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দিল রজতকে।

রজত বলে—তাহলে বন্ধুর বিয়েতে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে যে।

কল্যাণ বলে—বন্ধু বলেই যখন উভয়ে উভয়কে মেনে নিলাম, তখন আর ঐ 'আপনি'র বাধা কেন ভাই?

রজত হেসে বলে—না। ও বাধা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। তুমি আজ নিশ্চয়ই যাবে।

—যাবো বইকি বন্ধু, কিন্তু আমি ভাবছি, শ্রমিকদের যদি নিমন্ত্রণ করতে তাহলে বড়ই ভাল হতো!

—ওদের নিমন্ত্রণ আগেই করা হয়েছে। ওদেরকে নিমন্ত্রণ করতে এসেই তো তোমাকে পেলাম।

—তাহলে আর আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই বন্ধু। আমি নিশ্চয়ই যাবো।

সতের

বিবাহ বাসর।

সুসজ্জিত বরবধূ পাশাপাশি দুখানা পিঁড়িতে বসে। সামনে পুরোহিত; পুরোহিতের পাশে বসেছেন কনের বাবা, দেবেনবাবু।

চৌধুরী লজ-এর বাইরের উঠানে চাঁদোয়া খাটিয়ে তৈরি হয়েছে বাসর।

স্থানীয় বাঙালীরা সবাই এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। আর যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সিভিল সার্জন এবং মাইনিং– [illegible] ও কর্মচারিবৃন্দ। হরিশঙ্করবাবু গলব[illegible] করছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভূরিভোজ[illegible] করছেন সবাইকে।

ওদিকে মেয়ে মহলের ভার নিয়েছেন অমলা দেবী নিজে। মেয়েদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় এবং সবাইকে যাতে সমান যত্নে খাওয়ান হয় সেদিকে তাঁর কড়া নজর।

দশজন লোক সমানে পরিবেশন করছে। তিনজন চাকর আর তিনজন ঝি নিযুক্ত আছে হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিতে।

রাত ন'টার মধ্যেই আহার-পর্ব শেষ হয়ে গেল। তারপরেই আরম্ভ হ'ল বিবাহ-অনুষ্ঠান।

অগ্নি, নারায়ণ সাক্ষী করে রজত চৌধুরী কল্যাণীকে গ্রহণ করলো পত্নীরূপে। কনের বাবা দেবেনবাবু শাস্ত্র-সম্মতভাবে সম্প্রদান করলেন মেয়েকে।

এর পরেই বর প্রদক্ষিণ অনুষ্ঠান।

পিঁড়িশুদ্ধ কনেকে তুলে সাতবার ঘুরানো হ'ল বরের চারপাশে।

অবশেষে শুভদৃষ্টি আর মালাবদল।

রজত তাকায় কল্যাণীর দিকে আর কল্যাণী রজতের দিকে।

দু'জনেরই মনে আনন্দ, চোখে লজ্জা। রজত তার গলার মালাটি খুলে পরিয়ে দেয় কল্যাণীর গলায়। কল্যাণীও তার মালাটি পরিয়ে দেয় রজতের গলায়।

মেয়েরা শাঁখে ফুঁ দেয়। বাইরে রসুনচৌকিতে বেজে ওঠে মিলন রাগিণী। বাদ্যকররা মনের আনন্দে বাজনা বাজাতে আরম্ভ করে।

ঠিক এই সময় বাড়ির বাইরে বহুকণ্ঠের স্লোগান শুনতে পাওয়া যায়। খনির এক কর্মচারী ছুটতে ছুটতে এসে হরিশঙ্করবাবুকে খবর দেয় ধর্মঘটি শ্রমিকের দল শোভাযাত্রা করে এদিকে আসছে!

হরিশঙ্করবাবু ব্যস্ত এবং বিরক্ত হয়ে ওঠেন এই কথা শুনে। তিনি নিমন্ত্রিত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়ে বলেন—ধর্মঘটি শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে এদিকে আসছে, কি করা যায়, বলুন তো?

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন—আপনি আমার আর্দালীকে ডাকুন, আর্দালি আসলে তিনি তাকে নির্দেশ দেন সে যেন এই মুহূর্তে থানায় গিয়ে অফিসার-ইন্-চার্জকে বলে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে আসে। তারপর বলেন, "ইনক্লাবওয়ালাদের আজ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মজাটা। ওদের আজ আমি এমন শিক্ষা..."

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথা শেষ হবার আগেই রজত এসে হাজির হয় তাঁর সামনে। সে বলে—ওদের আসতে দিন, স্যার। আমি নিজে যেয়ে ওদের নিমন্ত্রণ করে এসেছি। এ বাড়িতে ওরা আজ নিমন্ত্রিত।

এই বলে হরিশঙ্করবাবুর দিকে তাকিয়ে সে অনুরোধ করে বলে—ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন, দাদু। নিমন্ত্রিতদের যেভাবে অভ্যর্থনা করে খাইয়েছেন, ওদেরও যেন ঠিক সেইভাবেই করা হয়।

রজতের কথা শুনে হরিশঙ্করবাবু বলেন—এ তুমি বলছ কি দাদু-ভাই! ওদের তুমি নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছ?

—হ্যাঁ দাদু, আমার মান-সম্ভ্রম যেন রক্ষা হয়।

ওদিকে শোভাযাত্রীর দল তখন গেটের কাছে এসে পড়েছে প্রায়। শ্রমিকনেতা কল্যাণ গাঙ্গুলী পরিচালনা করছে সে শোভাযাত্রা।

সর্বাগ্রে আসছে সে। তারপর মেয়েরা। মেয়েদের পেছনে পুরুষের দল। মেয়েরা এসেছে ফুলের সাজে সেজে।

বাড়ির সামনে এসে ওরা স্লোগান দেয়—ইনক্লাব! ··জিন্দাবাদ! ···রজত চৌধুরী! জিন্দাবাদ! ···কল্যাণী দেবী! জিন্দাবাদ!

সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। সবাই ছুটে আসে ওদের দেখতে।

কল্যাণীর হাত ধরে রজতও এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে।

রজতকে দেখেই কল্যাণ গাঙ্গুলী এগিয়ে এসে বলে—আমিও এসেছি বন্ধু!

রজত হাসিমুখে বলে হ্যাঁ, সারা শহর জানিয়ে এসেছ।

এই সময় রঙিয়া হঠাৎ ছুটে এসে বর-বধূর সামনে দাঁড়িয়ে বলে— হামি ভি এসেছি ছোটা মালিক। তুর বহু দেখব

রজত কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বলে মত কাছে টেনে নাও, কল্যাণী।

কল্যাণী এগিয়ে গিয়ে রঙিয়ার হাত এসো বাহিন

রঙিয়া বলে – বহুজী, হামরা আজ 'মধু বসন্তের' গান গাইব। ছোটা মালিকের বিয়াতে আজ হামাদের 'মধু বসন্ত' উৎসব।

এই সময় হরিশঙ্করবাবু তাদের সামনে এগিয়ে এসে বলেন— আগে খেয়ে নেবে চল। তারপর যত খুশি 'মধু বসন্তের' গান গাইবে।

রঙিয়া বলে - না মালিক, আগে খাইলে গান ভাল হোবে না। আগে গান হোবে।

এই বলেই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে ইঙ্গিত করে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা এসে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। বেজে ওঠে মাদল।

মাদলের তালে তালে সাঁওতালী নাচ নাচতে থাকে মেয়েরা। একটু পরে পুরুষরাও এসে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে।

ওদের নাচে আর গানে রজত আর কল্যাণীর [illegible] অপরূপ রূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

ভাবী মালিক শ্রমিকের মিলন-সুর বেজে ওঠে।